আমেরিকার দাদাগিরি এখন অনেক দেশই মানবে না
— পৃঃ ১০

স্বস্তিকা

দাম : বারো টাকা
৭৪ বর্ষ, ৪ সংখ্যা।। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২১
৩ আশ্বিন - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩
website : www.eswastika.com

দুর্গাপূজার নেপথ্যে

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা, ৩ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২০ সেপ্টেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

নন্দীগ্রামে পরাজয়ের গ্লানি কীভাবে মুছবেন 'ঘর-মুখো মমতা? □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

ভবানীপুর ভোটের ভবিষ্যৎ □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

করোনা সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে প্রথম ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক □ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মমনিয়াম □ ৮

আমেরিকার দাদাগিরি এখন অনেক দেশই মানবে না □ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী □ ১০

হরপ্পা সভ্যতায় কথা বলার ভাষা □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৩

বিধান পরিষদ প্রতিনিধিত্বমূলক না হলে সেটা অগণতান্ত্রিক □ ড. সুজিত রায় □ ১৫

আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত করা অসম্ভব □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৭

অয়ি গিরিনন্দিনী নন্দিতমোহিনী □ অনামিকা দে □ ২৩

সাক্ষাৎকার : মৃৎশিল্পীদের প্রতি উদাসীন সরকার □ পশুপতি রুদ্রপাল □ ২৪

সাক্ষাৎকার : অস্ত্রবিহীন মাকে দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলি □ অনামিক দে □ ২৫

মায়ের সাজ তৈরিতে ব্যস্ত বনকাপাসির শোলার সংসার □ অগ্নিশিখা □ ২৬

বাজেটে করোনার কোপ দিশেহারা মণ্ডপশিল্পীরা □ স্বপন দাস □ ২৭

নিরস্ত্র দুর্গা, উজ্জীবিত মহিষাসুর □ চন্দ্রভানু ঘোষাল □ ২৯

বৃহদেশ্বর দেবাদিদেবের অনুপম দেউল □ কৌশিক রায় □ ৩১

পর্যটন মানচিত্রে মোগলমারি এবং কুরুম্বেরা খাসতালুক হতে পারে □ বিপ্লব বরাট □ ৩৩

কেবল বিজেপি ঠেকাও ইস্যুতে দিদি 'দাদা' হতে পারবেন কি? □ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৩৫

পুরাণ ও হিন্দুত্বে এখনও মজে বাংলা বিনোদন □ জিৎ সরকার □ ৩৯

ধর্মীয় আধিপত্যের ভাবনা দেশকে দুর্বল করে □ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী □ ৪৩

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের উৎস সন্ধানে □ ড. অশোক কুমার দাস □ ৪৪

বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি বিভাজন : সিঁদুরে মেঘ □ বিশ্বামিত্র □ ৪৭

বিশের অঙ্গীকার, বাংলা ভাষা সংস্কার □ স্বর্ণাভ মিত্র □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ চিত্রকথা □ ৫০

প্রকাশিত হবে
২৭ সেপ্টেম্বর
২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২৭ সেপ্টেম্বর
২০২১

দ্বিশতবর্ষ পূর্তির আলোকে
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এবছর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের ২০০তম বর্ষপূর্তি। বঙ্গজীবনে সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

লিখবেন শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকরা।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৮

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের লেখায় ভরে উঠবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা।

।। দাম : ৫০.০০ টাকা।।

আপনার কত কপি প্রয়োজন সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানান।

সম্পাদকীয়

নেপথ্য শিল্পীদের দুর্দিন

বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল দুর্গাপূজা। মা আসিবেন, তাই চারিদিকে সাজো সাজো রব পড়িয়া যায়। এই সাজিবার রব শুধু মানুষের মাধ্যেই নহে, প্রকৃতিদেবীও জানিয়ে দেন মায়ের আসিবার সময় হইয়াছে। মাকে বরণ করিবার জন্য প্রকৃতিদেবী তাহার সম্ভারের ডালি সাজাইয়া অর্ঘ্য নিবেদনে প্রস্তুত হন। বাঙ্গালির মনেও আনন্দের হিল্লোল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'আশ্বিনে' কবিতায় সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে— 'আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল, উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরণ আলো; সবুজে সোনায় ভূলোক দ্যুলোকে মিল, দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো।' বিগত দুই বৎসর যাবৎ এই ভালো লাগা আনন্দের তাল কাটিয়া গিয়াছে করোনা মহামারীর ভয়াল ভ্রূকুটিতে। এই মহামারীর প্রকোপে এযাবৎ বহু প্রাণ নিঃশেষ হইয়াছে শুধু নয়, কত মানুষ, কত পরিবারও সর্বস্বান্ত হইয়াছে, রোজগার হারাইয়া পথে বসিয়াছে। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করিয়া শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতির সূচক ঊর্ধ্বগামী হইয়া ওঠে। সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষটি হইতে ধনীতম ব্যবসায়ী পর্যন্ত ইহাতে সহভাগী হন। গ্রামেগঞ্জের হতদরিদ্র মানুষটিও তাহার সংবৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের কড়িটুকুও এই সময়েই সংগ্রহ করিয়া ফেলেন। কিন্তু করোনা মহামারীর কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি স্তব্ধ হইয়া বাঙ্গালির এই শ্রেষ্ঠ উৎসবটির আনন্দ ম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রতিদিন পিঠে জীবিকার হাতুড়ি পড়া মানুষদের মুখগুলি আজ বেদনাবিধুর। দুর্গপূজার নেপথ্যে যাহারা রহিয়াছেন, তাহারাই আজি সবচেয়ে বেশি অসুখী। কবি বুদ্ধদেব বসুর 'ভাদ্রের দিনে ভাবনা' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে যেন এই নেপথ্যে থাকা মানুষদেরই আর্তি ঝরিয়া পড়িতেছে— 'ঋণজর্জর জীর্ণ জীবনে শরতের উঁকিঝুঁকি পারে না করতে সুখী, শ্রাবণের কালো এখনই আলোয় গলবে, বৃষ্টি শেষের নীল বন্যায় জ্বলবে, ছিন্ন মেঘের ছন্নছাড়ার দল, আমি বসে ভাবি সংসার কীসে চলবে।' করোনা মহামারীর কারণে এই অবস্থায় দুর্গাপূজার নেপথ্যে থাকা মানুষদের, বিশেষ করিয়া মৃৎশিল্পীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া দেওয়ার কথা তো রাজ্যপ্রশাসনের! কেননা এই শিল্পই তাহাদের জীবনজীবিকা। গত বৎসর হইতে কুমোরটুলির এই শিল্পীরা প্রায় কর্মহীন হইয়া পড়িয়াছেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমোহিনী প্রকল্প, ক্লাবে ক্লাবে অর্থ বিতরণ শুধুই ভোট সংগ্রহের জন্যই। রাজ্যে শিল্প স্থাপন, কর্মসংস্থানের কোনও পরিকল্পনা নাই। এই দুর্দিনে মৃৎশিল্পীরা বড়ই অসহায় বোধ করিতেছেন।

আরও একটি বিষয় ভাবিবার রহিয়াছে। দুর্গাপূজা হইতেছে বাঙ্গালির শক্তি-আরাধনা। মা দুর্গা সেই শক্তির প্রতীক। মা দুর্গা রাষ্ট্র তথা ভারত প্রতিমা। বাঙ্গালি হিন্দুর বিশ্বাস, দুর্গাপূজার পরিমণ্ডলে মা দুর্গা মানুষের মনের সর্বপ্রকার অবগুণ নাশ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। দেশের পরাধীনতার কালে অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ রাষ্ট্রবাদী নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পাড়ার দুর্গাপূজায় যুক্ত থাকিতেন। স্বাধীনোত্তর কালেও বিভিন্ন পূজায় ভক্তিভাবের অভাব ছিল না। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতি-বিরোধী কমিউনিস্টরা পূজাপার্বণে সামান্যতমও আস্থা না থাকা সত্ত্বেও দুর্গাপূজার বিভিন্ন কমিটিতে অংশগ্রহণ করিয়া পূজার অন্তর্নিহিত শুদ্ধ ভাবটিকে কলুষিত করিবার প্রয়াস করিয়াছে। এখনও তাহাই চলিতেছে। থিমপূজার ভাবনা তাহাদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। ইহারই অঙ্গ হিসাবে কোথাও কোথাও অস্ত্রহীন মাতৃমূর্তির পূজা হইতেছে। ইহা মোটেও শুভ লক্ষণ নহে। ইহা সুপরিকল্পিত চক্রান্তেরই অংশ। কালে কালে মহামারী আসিয়াছে। প্রশাসনের তৎপরতায় এবং মানুষের সচেতনতায় তাহা হইতে মুক্তিও মিলিয়াছে। কিন্তু পূজার মূল ভাবের বিকৃতি ঘটাইলে মানুষ অপশক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইবার মানসিক শক্তি কোথায় পাইবে? শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে।

সুভাষিতম্

গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাপি জাগ্রতঃ স্বপতোহপি বা।
ন বিচারময়ং চেতো যস্যাসৌ মৃত উচ্চতে।।

যে ব্যক্তির মন চলতে চলতে, অবস্থান করতে করতে, জাগ্রত অবস্থায়, এমনকী স্বপ্নাবস্থাতেও বিচারশীল নয়, বিদ্বজ্জনরা তাকে মৃত বলে মনে করেন।

নন্দীগ্রামে পরাজয়ের গ্লানি কীভাবে মুছবেন ‘ঘর-মুখো’ মমতা?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে পরাজিত হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আনুমানিক ৩২ বছর পর এটাই তাঁর প্রথম পরাজয়। নিশ্চিতভাবে তাঁর মতো ‘হেভিওয়েট’ প্রার্থীর কাছে এটি বিরাট গ্লানি। ১৯৮৯ সালে সিপিএম-এর মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে শেষবার হেরেছিলেন মমতা। মালিনী ভট্টাচার্যের কাছে এই জয় আজও শ্লাঘার বিষয়। তখন মালিনী জানতেন না যে মমতা একদিন মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

এবার বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী মমতাকে হারিয়ে মালিনীর সেই রেকর্ড ছুঁলেন। মালিনী ‘জায়ান্টকিলার’ হতে পারেননি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে হারিয়ে শুভেন্দু তা হলেন। ‘হোমগ্রাউন্ড’ ভবানীপুর কেন্দ্র ছেড়ে এটাই মমতার প্রথম পরাজয়। এই পরাজয় বুঝিয়ে দিয়েছে ‘দেশের বাইরে’ বা নিজ কেন্দ্রের বাইরে তিনি খেলতে পারেন না। তাঁর পরাজয় হয়েছে তাঁরই একসময়ের ছায়াসঙ্গী ও দক্ষিণ হস্ত বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে। ২০২০ ডিসেম্বরে মমতাকে পরিত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু। মমতার ভাইপো সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছুঁড়ে দেন তিনি। সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১৯০০-র কিছু বেশি ভোটে হেরে যান মমতা। পরাজয়ের সে গ্লানি মেনে নিতে না পেরে আদালতের দ্বারস্থ হন মমতা। সে মামলা আদালতে বিচারাধীন। একদা নিজের লোকের কাছে হেরে যাওয়ার ‘লজ্জা’ মাথায় নিয়ে তাই আবার ঘরমুখো বা ‘ঘর ওয়াপসি’ হয়েছেন মমতা। ৬ মাসের মধ্যে নতুনভাবে নির্বাচিত হতে না পারলে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে।

শুভেন্দুর কাছে হেরে গেলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৫ মে শপথ নেন মমতা। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা তাঁকে ‘হেরো’ মুখ্যমন্ত্রীর তকমা দেন। স্বভাবসিদ্ধভাবেই সে তকমা মুছে ফেলেন মমতা। কারণ তাঁর কাছে ‘তক্ত’ বা আসন বা পদের দাম তকমার থেকে অনেকটাই বেশি। মমতাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য খানিকটা ধাক্কা দিয়েই ভবানীপুর থেকে খড়দা কেন্দ্রে সরিয়ে দেওয়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ববরিষ্ঠ বিধায়ক ও নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে। খানিকটা বাধ্য হয়েই মুখ বুজে তা মেনে নেন শোভনদেববাবু। খড়দার তৃণমূল বিধায়কের মৃত্যুর ফলে ওই আসন ফাঁকা হয়ে যায়। ‘বাংলার মেয়ে’-কে এবার ‘ভবানীপুরের মেয়ে’ করে তুলতেই এই ব্যবস্থা।

মমতার বিরুদ্ধে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভবানীপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল। রাজনৈতিক মহলের ধারণা মমতাকে এটা এক প্রকার ‘ওয়াক-ওভার’ দেওয়া। আমিও হলফ করে বলতে পারি গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ২৯৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ক’জন প্রিয়ঙ্কার নাম জানেন। প্রিয়ঙ্কাকে সাধুবাদ দিতেই হয় যে বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে তিনি এই ‘ভীষণ রকম অসম লড়াই’ মাথা পেতে নিয়েছেন। মমতার বিরুদ্ধে লড়তে পাওয়ার এই সুযোগ তাঁকে অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

তিনি তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্বাচনোত্তর হিংসার মামলা করেন। তার সিবিআই তদন্ত শুরু হয়েছে। কিছুদিন আগেই বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের অনেক নীচুতলার নেতা স্বর্ণকমল সাহার কাছে তিনি এন্টালি কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে (আনুমানিক ৫৮ হাজার) পরাজিত হন। আর এবার তিনি লড়েছেন তৃণমূলের সর্বাধিনায়িকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সাধারণের চোখে লড়াইটি হাস্যকরই নয় অনেকটা বেমানানও বটে।

শুভেন্দু ‘জায়ান্ট কিলার’ আর মমতা?
নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে হেরে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্নির্বাচনের জন্য ভবানীপুর কেন্দ্রে লড়তে এসেছেন। এবার তাঁর চ্যালেঞ্জ।

তবে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৮৪ সালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সিপিএম-এর সর্বভারতীয় নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে এরকমই এক হাস্যকর আর বেমানান লড়াইয়ে পরাজিত করে রাজনীতির আলোয় চলে আসেন মমতা। সেদিনের সেই ‘ডেভিড মমতা’ বনাম ‘গোলায়েথ সোমনাথের’ লড়াইয়ে সবাইকে অবাক করে মমতাই জিতেছিলেন। তাই ভবানীপুর নির্বাচন মমতা জিতলেও তা যে তাঁর কাছে সুখের জয় হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। কারণ তাঁর জীবনের সব থেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ নন্দীগ্রাম তিনি হেরে বসে আছেন। আর সেই হার কোনও ভাবেই পোশানো যাবে না।

রাজ্য-রাজনীতির ইতিহাসে শুভেন্দুর কাছে মমতার সে হার ‘কালো দিনের’ মতো হয়ে থাকবে যেমন থেকে গিয়েছে রায়বেরেলিতে রাজনারায়ণের কাছে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়। মমতার সাদা কাপড়ে শুভেন্দুর ছিটিয়ে দেওয়া পরাজয়ের কালো কালি কোনওদিন মুছবে না। মমতা যদি ভবানীপুর সব ওয়ার্ডের সব ভোটও পান তাও তা মুছবে না। প্রিয়ঙ্কার বিরুদ্ধে এই অসম লড়াইয়ে মমতা হয়তো জিতবেন। কিন্তু রাজনৈতিক চালচিত্রে অনেকটা শিবের মতন। ওপর থেকে শুভেন্দু ফিক ফিক করে হেসে বলবেন, ‘উনি তো ধরা-করার মুখ্যমন্ত্রী। জোর করেই জেতানো হয়েছে’। মমতার সে গ্লানি কখনো মুছবে না। ইতিহাসে রেকর্ড থেকে যাবে।

শুভেন্দু ‘জায়ান্ট কিলার’ আর মমতা?

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে হেরে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনর্নির্বাচনের জন্য ভবানীপুর কেন্দ্রে লড়তে এসেছেন। এবার তাঁর চ্যালেঞ্জ। ▮

ভবানীপুর ভোটের ভবিষ্যৎ

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা

নির্বাচন কমিশন সদয় হয়েছে। বিজেপিও আইনের পথে যায়নি। ভবানীপুর থেকে উপনির্বাচনে জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরবচ্ছিন্নভাবে মুখ্যমন্ত্রী থাকার পথ অনেকটাই মসৃণ হয়েছে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও উপনির্বাচন নিশ্চিত হওয়ায়।

এটা ঠিক যে, গণতন্ত্রে সংখ্যাই শেষ কথা বলে। যার সঙ্গে ভোটের সংখ্যা বেশি, সেই জয়ী। এ তো শুধু গণতন্ত্র বা নির্বাচনেই নয়, খেলা থেকে লেখাপড়া সবেই প্রথম বাছা হয় সংখ্যার হিসেব দিয়ে। তাই ভবানীপুরের উপনির্বাচনে কী ফল হবে সেটা দিয়েই ঠিক হবে কে জয়ী, কে পরাজিত। কিন্তু জয় ও পরাজয়ের মাঝেও একটা বড়ো জিনিস রয়েছে, যার নাম লড়াই। না, ভালো লড়াই মানেই সেরা এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু ভালো লড়াই অনেক শিক্ষা দেয়, ভবিষ্যতের জন্য অনেক পাথেয় দেয়। আর লড়াইয়ের আগে ফলের কথা ভাবাই তো নিরর্থক।

অনেকেরই সাধারণ হিসেব বলে, উপনির্বাচন মানে শাসক দলের জয় নিশ্চিত। আর জেতা আসনে তো বটেই। হারা আসনেও যে শাসক দল উপনির্বাচনে ভালো ফল করে তার উদাহরণ তো হাতের কাছেই। ২০১৯ সালে এই রাজ্যেই বিজেপি দারুণ ফল করার পর উপনির্বাচন হয়েছিল বেশ কয়েকটি আসনে। আর তাতে ভালো ফল করে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। উদাহরণ হিসাবে সবচেয়ে ভালো বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ছেড়ে যওয়া আসন খড়্গপুর সদর। ওই আসন ছেড়ে দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুর লোকসভা আসন থেকে সাংসদ হন। পরে ওই খড়্গপুর সদর আসনে জেতেন তৃণমূলের প্রদীপ সরকার। আর এ তো ভবানীপুর। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর আসন।

আসলে উপনির্বাচন যখন রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় কোনও পরিবর্তন আনতে পারবে না বলে বোঝা যায়, তখন সাধারণ ভোটাররা দ্বিতীয় চিন্তা কম করেন। এমনকী ভোট দিতেও সেভাবে আগ্রহ দেখান না। সেটা পরিসংখ্যানই বলে দেয়। এ ক্ষেত্রেও আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি ভবানীপুর কেন্দ্রকেই। মনে রাখবেন, ভবানীপুর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনে জিতেছেন একবারই। সেটা ২০১৬ সালে। তার আগে ২০১১ সালে উপনির্বাচনে জিতেছিলেন তিনি। এবারেও উপনির্বাচন। এবার তথ্য কী বলছে দেখা যাক।

২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুব্রত বক্সি যখন জিতেছিলেন, তখন এই আসনে ভোট পড়েছিল ১,৩৫,৭৪১টি। যা মোট ভোটারের ৬৩.৭৮ শতাংশ। পরে মুখ্যমন্ত্রী যখন উপনির্বাচনে প্রার্থী হলেন তখন সেটা কমে হয়ে যায় ৯৫,০৬৪ অর্থাৎ ৪৪.৭৩ শতাংশ। মানে ১৯.০৪ শতাংশ কম। আবার ২০১৬ সালে মমতা যখন জিতলেন তখন ভোট পড়ে ১,৩৭,৪৭৫টি। মোট ভোটারের ৬৬.৮৩ শতাংশ। ২০২১ সালে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় যখন জিতলেন তখন ভোট পড়ে ১,২৭,৫৩৬টি। মানে ৬১.৭৯ শতাংশ।

এত সংখ্যার কচকচির জন্য পাঠক আমায় মাফ করবেন। কিন্তু এই উপনির্বাচন যেহেতু একটা বদলের সম্ভাবনাময় তাই এই হিসেব নিকেশ করা দরকার। এক্ষেত্রে আরও একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, এই আসনে ভোটদানের হার রাজ্যের গড় হারের চেয়ে অনেক কম। আর এই ভোটের হার বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপরেই নির্ভর করে ফল। ভবানীপুরের সাম্প্রতিক ফলগুলি বলছে, ২০১১ সালে সুব্রত বক্সি জেতেন ৪৯,৯৩৬ ভোটে। পরের উপনির্বাচনে মমতা জেতেন ৫৪,২১৩ ভোটে। মনে রাখতে হবে, তখনও বিজেপি ভবানীপুরে তো বটেই এই রাজ্যেও নির্বাচনী শক্তিতে অনেক পিছিয়ে। বিজেপি একটু জমি শক্ত করার পরে সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মুখ্যমন্ত্রী থাকা অবস্থায় ২০১৬ সালে জেতেন ২৫,৩০১ ভোটে। ভোট প্রাপ্তি কমে যায় ২৯.৭৯ শতাংশ। আর ২০২১ সালে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জেতেন ২৮,৭৮৬ ভোটে। তৃণমূলের ভোট বেড়েছে ১০.০৪ শতাংশ। বিজেপির ভোট বেড়েছে ১৬.০৩ শতাংশ।

এতসব হিসেব থেকে একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে, ভবানীপুরের লড়াই কারও কাছে সহজ নয়। কলকাতার এই এলাকা আসলে মিনি ভারত। সব ভাষার মানুষ আছেন এখানে। বড়ো অংশের ভোটার আদত বাসিন্দা ভিন রাজ্যের। এখানে অনেক গুজরাতি আছেন। মোদী, শাহ-র রাজ্যের মানুষ যাঁদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল 'বহিরাগত গজ্জু' বলে আক্রমণ করেন। বিজেপিকে 'হিন্দিভাষী'-দের দল বলে আক্রমণ করে তৃণমূল। তাঁরাও বড়ো অংশ থাকেন ভবানীপুরে। এই ভবানীপুর শিখেদের বাসস্থান। এখানে বস্তি যেমন রয়েছে তেমনই রয়েছে অনেক বহুতল। সবাইকে নিয়ে আসতে হবে ভোটের লাইনে। আর সেটা হলে তৃণমূলের জয় অত সহজ হবে না। পাঠকেরা অবাক হয়ে যাবেন এটা জেনে যে এই আসনেই রয়েছে কলকাতা পুরসভার ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড খিদিরপুর অঞ্চলের এই একটি ওয়ার্ডই তৃণমূলের বড়ো ভরসা। গত বিধানসভা নির্বাচনে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় যে ২৮ হাজার ভোটে জিতেছেন তার প্রায় সবটাই ওই মুসলিম ওয়ার্ড থেকে এগিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, তৃণমূলের ভবানীপুরে আসলে লড়াইটা হয় ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড বনাম বাকি গোটা এলাকার। এবার অঙ্কটা কষে ফেলুক বিজেপি। লড়াইটা কিন্তু ভবানীপুরের একার নয়। রাজ্য জুড়ে ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসের মুখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম অত্যাচারিতদের আইনি জয় পাইয়ে দেওয়া প্রতিবাদের মুখ প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালের।

অতিথি কলম

কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মনিয়াম

করোনা সংক্রমণের প্রেক্ষাপটে প্রথম ত্রৈমাসিক অর্থনৈতিক ফলাফল অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক

বিশ্বমন্দার সময় পরিস্থিতি বুঝতে ব্যর্থতার কারণে অর্থনীতির তুমুল অবনমন ঘটেছিল। এবারে সঠিক বুদ্ধিমত্তা ও মহামারীর অভিঘাত সফলভাবে বোঝার কারণে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনীতিকে বলবান করে ভারত এই শতাব্দীতেও বিরল এক মহামারীর স্মরণীয় মোকাবিলা করেছে।

২০০৮ সালের মার্কিন দেশ থেকে উদ্ভূত বিশ্বব্যাপী মন্দার পরবর্তী সময়ে যে অর্থনৈতিক পুনরুত্থান হয়েছিল ভারতের করোনা নিস্তেজ হওয়ার প্রারম্ভের নতুন অর্থবর্ষের পুনরুদ্ধার তার তুলনায় অত্যন্ত শক্তিশালী ইঙ্গিত বহন করছে।

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে আমরা আগাম জানিয়ে ছিলাম যে দেশের জিডিপি ব্যাপক পতনের পর তার বৃদ্ধির হারে একটি V আকৃতির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। যে সময় এ কথায় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। একজন ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন, 'একটি ঊষর মরুভূমিতে একবিন্দু জলের চিহ্নমাত্র না থাকা পরিস্থিতিতে দেশের অর্থমন্ত্রী ও তাঁর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সবুজের উন্মেষ দেখতে পাচ্ছেন। হায় রে!' তাঁর বিষয়ের সূক্ষ্মতা ও ইঙ্গিত বোঝার অক্ষমতা তাঁর আরও একটি বিবৃতিতে স্পষ্টতর হয়েছে— '২০১৯ সালের ত্রৈমাসিকের জিডিপি সংক্রান্ত সামগ্রিক আয়ই এই এক বছরে ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেছে।' অর্থাৎ দেশ তিন মাসে কোনো অর্থনৈতিক সম্পদ বাস্তবে তৈরিই করতে পারেনি।

বলা দরকার, জিডিপি-র উত্থান-পতনগুলির হিসেব কখনই কোনো ট্যাঙ্কে থাকা জলমাপার যন্ত্র নয় যে ঝট করে বলা যাবে ভেতরে কত জল আছে। উলটে জিডিপি-র পরিমাণ হচ্ছে বহতা জল একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে কী গতিতে বইছে, অর্থাৎ দেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রবাহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতটা ইতিবাচকভাবে বইছে সেটিকে নিরীক্ষণ করা। সত্যিই যদি জিডিপি কত স্টক আছে তা মাপার যন্ত্র হতো তাহলে সহজেই বলে দেওয়া যেত স্টক বা সম্পদ এত শতাংশ খোয়া গেছে।

আসলে রাজনীতি করতে অভ্যস্ত মানুষেরা যে কোনো বস্তুর মধ্যেই জল-তেল-মশলা মিশিয়ে মূল থেকে সরে গিয়ে এমন একটা জিনিস উপস্থাপন করতে অভ্যস্ত যাতে রাজনৈতিক লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমজনতার সহজ হাততালি জোটানো যায়। এর তুলনায় অর্থনীতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলি ও চলাচল অনুধাবন করার কাজ যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। তাই পরিহার করেন। আমরা এবার প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলি পর্যালোচনা করব। গত বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি বিগত বছরের তুলনায় ২৪ শতাংশ কমে গিয়েছিল। এরপর অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ত্রৈমাসিক হিসেবে হার দাঁড়ায়— ৭.৫, ০.৪, ১.৬, এই সর্বশেষ ক্ষেত্রে ২০.১ শতাংশ। এই গুলিকে পরপর সাজালে একটি V আকৃতির অর্থনৈতিক পুনরুত্থানই দেখা যাবে। এর মধ্যে বহুবিধ ক্ষেত্রের উন্নতিই যুক্ত হয়েছে। যেমন হাতের ৫টি আঙুল বিভিন্ন আকৃতির লম্বা, ছোটো ছোটো বা স্থূল হয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রগুলির ধাঁচও কখনও এক হয় না। কিন্তু যে V আকৃতির উন্নতির কথা বলা হলো তা কিন্তু অর্থনীতির মূল ক্ষেত্রগুলির উত্তরণের সূচক। এই সূত্রে ২০১৯-২০ সালের যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা প্রকাশ করা হয়েছিল সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছিল করোনা পূর্ববর্তী সময়েই যে অর্থনৈতিক স্লথগতি নজরে পড়ছিল তার মূলে ছিল ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র। এর উৎপত্তি হয়েছিল নিজেদের লোককে ব্যাঙ্ক ঋণ পাইয়ে দেওয়া এবং ব্যাঙ্ক পরিচালনা ও ব্যাঙ্কিং নীতি নির্ধারণে ব্যর্থতা। এটা শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের আগে, সকলেই জানেন। সারা বিশ্বে পরিচালিত বহু অর্থনৈতিক গবেষণায় উঠে এসেছে যে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে যদি বড়োসড়ো গণ্ডগোল এবং পরিচালনায় গলতি থাকে তাহলে তা থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক অধোগতি সামাল দিতে বহু সময় লাগে। মজার কথা হলো, পরিচিত অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রথম ব্যাঙ্ক লোন পাওয়ার পর তাদের শোধ করার সময়সীমা কম করে ৫/৬ বছর হয়। এই ধরনের মতলববাজদের দেয় ঋণকে বিভিন্ন অছিলায় ব্যাঙ্কের তরফে পুনর্গঠন করে চিরজীবী করে রাখার যে নিরন্তর খেলা চলেছিল তাঁর কুফল দেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের ওপরও প্রভাব ফেলছিল। এর পরিণতিতে অর্থনীতির

দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি সাধিত হয়ে যায়।

কিছু পণ্ডিত বিশ্লেষক বলে থাকেন যে, করোনা পূর্ববর্তী অর্থনৈতিক নিম্নগতির উৎস বিমুদ্রীকরণ ও জিএসটি চালু করে দেওয়া। কিন্তু বিমুদ্রীকরণের সময়েই চালানো অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব নিয়ে গবেষণা এবং জিএসটি-র প্রভাব নিয়ে পৃথক গবেষণায় জিডিপি'র ওপর এর কোনো প্রভাব দেখা যায়নি। বস্তুত এই ধরনের ব্যাখ্যা দেশের মজবুত মৌলিক অর্থনৈতিক ধাঁচাটিকে আক্রমণ করারই শামিল।

বাস্তবে প্রখর করোনা দাপটের সময়ের অর্থনৈতিক ত্রৈমাসিক বৃদ্ধির লক্ষণ দেখলে সেখানে কোনোরকম অর্থনৈতিক বিধিনিষেধ ছিল কী না তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ অর্থনীতির মূল পরিসরটি অটুট ছিল। বিগত অর্থনৈতিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধিতে হ্রাস ঘটেছিল তা করোনা সংক্রান্ত লকডাউনের কারণে বেচা-কেনায় ঘাটতি ঘটায়। এবারের বড়োসড়ো বৃদ্ধি ক্রমিক করোনাজনিত নিষেধাজ্ঞায় ছাড়ের কারণে। এবারের প্রথম ত্রৈমাসিকের কালপর্বে মল, দোকান ও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান বহু রাজ্যে মে ও জুন মাসের দ্বিতীয় ধাপে বিধ্বংসী করোনা আক্রমণে সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। গুগলে খুচরো কাজকর্মের যে সংকেত দেওয়া হয় তাতে ৩১ মার্চের তুলনায় বছরের প্রথম ত্রৈমাসিক অর্থাৎ ২১ জুন পেরিয়ে মধ্য জুলাই পর্যন্ত তা নিম্নমুখী ছিল। চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময় খুচরো লেনদেন ৩১ মার্চ ২১-এর তুলনায় ৭০ শতাংশ নেমে গিয়েছিল। সরবরাহের দিক থেকে যে বড়ো ধরনের নিষেধাজ্ঞাজনিত ঘাটতি ভোগ্যপণ্যের ওপর দেখা দেয় তার ফলে সেই নীচু মাত্রার সংখ্যা থেকেই আজ ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। এবার জুলাই মাস থেকে ছাড় আরও নমনীয় হওয়ায় অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে।

সরকারের তরফে নেওয়া যুগান্তকারী সংস্কারগুলির কারণে অর্থনীতি শক্তিশালী বৃদ্ধির দোরগোড়ায়। করপোরেট ক্ষেত্রগুলি ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত মেদ ঝরিয়ে ও অন্য উপায়ে ব্যয় সংকোচন করেছে। ব্যাঙ্ক ও অন্য ক্ষেত্রের দেনা সফলভাবে শোধ করেছে। তারা এখন নতুন বিনিয়োগে প্রস্তুত। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এখন লাভের মুখ দেখছে। গরিষ্ঠাংশ ব্যাঙ্কেই ঋণ দেওয়ার পর বিশেষ করে খুচরো ও এসএমই (স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ) ক্ষেত্রে তা শোধ না করলে ব্যাঙ্ক তার মোকাবিলায় নিজেকে তৈরি রেখেছে। সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলি প্রতি ১ টাকা ঋণ অশোধিত হলে তার জন্য ৮৮ পয়সার সংস্থান করে ফেলেছে। অর্থাৎ পর্যাপ্ত প্রোভিশনিং করেছে। এছাড়া ব্যাঙ্কিং মূলধনের পর্যাপ্তকরণ ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কগুলি এখন মজবুত। তারা বাজার থেকে টাকা তুলেছে এবং মানুষ বিশ্বাস করে সেখানে টাকা ঢেলেছে। এর ফলে কর্পোরেট সেক্টরকে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক সর্বতোভাবে প্রস্তুত কেননা সবরকমের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই তারা নিয়েছে।

বিশ্ব মন্দার সময় (২০০৮) যে দু' অঙ্কের মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছিল করোনা সংক্রমণের পটভূমিতেও তা ৬.১ শতাংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর কারণ সরকারের তরফে সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। এখন নাইট কার্ফু ও এরিয়া লকডাউন প্রায় বন্ধ হওয়ায় সরবরাহ প্রায় স্বাভাবিক হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি আরও নিম্নমুখী। মার্কিন উদ্ভূত বিশ্বমন্দার সময় কিন্তু এই ধরনের বিধিনিষেধ অর্থনীতিকে মোকাবিলা করতে হয়নি। একই সঙ্গে সরকারের তরফে রাজস্ব ঘাটতি অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমতা রেখে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে সরকার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মেপেযুপে পরিমাণমতো খরচ করেছে। বিশ্ব মন্দার সময় কিন্তু বেহিসেবি খরচ করে পরিস্থিতি বাগে আনা তদানীন্তন সরকার অর্থনীতির ক্ষতি করেছিল। বিশ্বমন্দার সময় ১০ বিলিয়ন ডলার ভারত থেকে লগ্নিকারীরা উঠিয়ে নিয়েছিল আর সদ্য শেষ হওয়া বছর ২০২১-এ ভারতে ৩৬ বিলিয়ন ডলার এসেছে। বিশ্বমন্দার সময় নতুন আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ৮ বিলিয়ন ডলার ছিল, এই সংক্রমণের আবহে তা হয়েছে ৮০ বিলিয়ন অর্থাৎ ১০ গুণ বেশি। আন্তর্জাতিক বিনিময় হারের মানদণ্ড ডলারের বিশ্বমমন্দার সময় ভারতে ৬০ শতাংশ অবনমন হয়েছিল। গোটা করোনাকালে তা স্থির রয়েছে। এগুলি সবই অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই সূচক।

যে মূল বৃহৎ অর্থনৈতিক মানদণ্ডের এক আলোচনা হলো তাতে নতুন স্টার্টআপ কোম্পানিগুলির বড়ো ভূমিকা রয়েছে। গত ১৭ বছরের মধ্যে নতুন ব্যবসা তৈরির জন্য সর্বাধিক পরিমাণ কোম্পানি বাজারে শেয়ার ছেড়ে মানুষের কাছ থেকে সফলভাবে টাকা তুলেছে। এটি রেকর্ড। নিছক নিজের মেধাবলে সফল ব্যবসায়িক প্রয়াস বেড়ে চলেছে। এখানে পরিবারভিত্তিক অর্থ বা যোগাযোগের কোনো ভূমিকা নেই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই মেধাভিত্তিক উন্নয়ন অত্যন্ত সুলক্ষণ। বিশ্বমন্দার সময় পরিস্থিতি বুঝতে ব্যর্থতার কারণে অর্থনীতির তুমুল অবনমন ঘটেছিল। এবারে সঠিক বুদ্ধিমত্তা ও মহামারীর অভিঘাত সফলভাবে বোঝার কারণে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে অর্থনীতিকে বলবান করে ভারত এই শতাব্দীতেও বিরল এক মহামারীর স্মরণীয় মোকাবিলা করেছে।

(লেখক ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা)

শোকসংবাদ

গত ২৭ আগস্ট মেদিনীপুর শহরের স্বয়ংসেবক বিমান সিদ্ধান্ত মাত্র ৫২ বছর

বয়সে পরলোকগমন করেন। গত দু' বছর যাবৎ ডায়াবেটিসে ভুগে তিনি প্রায় দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র এবং ভাইদের রেখে গেছেন। তাঁর ভাই বিনয় সিদ্ধান্ত বর্তমানে মেদিনীপুর নগর কার্যবাহের দায়িত্বে আছেন।

আমেরিকার দাদাগিরি এখন অনেক দেশই মানবে না

বিশ্বের দরবারে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার শর্তহীন পলায়ন তাকে বিশ্বদাদাগিরির মর্যাদা থেকে এক ধাক্কায় মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। কুড়ি বছরেও আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকারগুলি যদি শক্তিশালী সৈন্যদল তৈরি করতে না পারে তার দায় কিন্তু আমেরিকার সরকার এড়াতে পারে না।

ড. নারায়ণ চক্রবর্তী

জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে যে নাটক শুরু হয়েছিল তা ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছালো ১৫ আগস্ট, ২০২১-এ বিনা রক্তপাতে কাবুল দখলের মধ্যে দিয়ে। শুরুটা অবশ্য করে গিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি আফগানিস্তান থেকে ধাপে ধাপে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। কাতারের দোহাতে এনিয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা বলেন। পরবর্তীতে অতিমারী ও নির্বাচনের জন্য এই সৈন্য অপসারণ প্রক্রিয়া আর বিশেষ এগোয়নি। আফগানিস্তানের শেষ নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনি তখন থেকেই বলতে থাকেন যে পাকিস্তানের জঙ্গিরা আফগানিস্তান দখলের চক্রান্ত করছে। এমনকী আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই কথাকে পাত্তা না দিয়ে পাকিস্তান দ্বারা লালিত-পালিত তালিবানগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে সৈন্য অপসারণ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে শুধু তাদের সঙ্গেই কথা বলে। ফলে, তালিবান আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে শুধু এগিয়েই যায়নি, তারা আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আমেরিকার ইচ্ছে ছিল, তারা অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী আফগান সৈন্যদল তৈরি করতে আফগান সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। যার ফলে, ভবিষ্যতে তালিবান, আইসিস বা অন্য কোনো জঙ্গি সংগঠন আফগানিস্তানে ঘাঁটি গেড়ে বসে আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করতে পারবে না। প্রতিটি দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ না বলা কথা থাকে। এখানে আমেরিকা তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা হিসেবে তালিবানদের দুর্বল দেখতে চাইলেও নির্মূল করতে চায়নি।

ফলে, ২০০১ সালে যখন তালিবান আফগানিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালো তখন তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলেও তাদের মধ্যে সমন্বয় রেখে তাদের সংগঠন টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নেয় পাকিস্তান এবং এ কাজে তারা তাদের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-কে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগায়। তালিবানের মাদক চোরাচালানের ব্যবসা সম্প্রসারণের পেছনে পাকিস্তানের অবদান প্রচুর। তাছাড়া, ওয়াহাবি ইসলামের চিন্তাধারায় সুন্নি তালিবান পাকিস্তানের মধ্যে সহমর্মিতার সন্ধান পায়।

এদিকে আমেরিকায় গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়ই বোঝা গিয়েছিল যে আমেরিকান মুসলমানেরা একযোগে বাইডেনকে ভোট দিয়েছে। বাইডেনের ডেপুটি কমলা হ্যারিসের কথাবার্তায় পরিষ্কার যে তারা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তুলনায় পাকিস্তানকে অধিকতর বন্ধু মনে করে। কাশ্মীর প্রশ্নেও কমলা হ্যারিসের অবস্থান সন্দেহজনক। যাই হোক, আফগানিস্তানে বাইডেন প্রশাসন প্রথম থেকেই তালিবানদের সঙ্গে ও তাদের বিশেষ বন্ধু পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা এবং পাকিস্তানের উপর নির্ভর করে এখন এমন অবস্থায় পড়েছে যে তাতে বাইডেনের ভোটব্যাঙ্কের তেমন ক্ষতি না হলেও কিন্তু বিশ্বের দরবারে আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার শর্তহীন পলায়ন তাকে বিশ্বদাদাগিরির মর্যাদা থেকে এক ধাক্কায় মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। এমনকী অন্তিম পর্যায়ে তালিবানের ধমকে ভীতসন্ত্রস্ত মনোভাব দেখিয়ে তাদের দাবিমতো বাইডেন ৩০ আগস্টের মধ্যে আমেরিকার সৈন্যদের আফগানিস্তান থেকে বের করে আনল। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এমনকী বিমান, হেলিকপ্টার ফেলে আমেরিকা পালিয়ে গেল। তারপর কুড়ি বছরের যুদ্ধশেষে বাইডেন পরাজিত সৈন্যদলের নেতার মতো সংবাদমাধ্যমে বার্তা দিলেন যে তিনি কত দ্রুততার সঙ্গে এই 'পলায়ন' প্রক্রিয়া সমাপ্ত করেছেন! প্রথম থেকেই আমেরিকা পরিকল্পনা করেছিল যে তারা তালিবানের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কারণ তারা আলোচনাপর্বে তালিবান ছাড়া আর কোনো আফগান গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের

বিষয়ে কথা বলেনি। অথচ ২০০১ সালে যখন তালিবানদের তারা হঠিয়ে দেয়, তারপর থেকে আফগানিস্তানে জনগোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আবার কুড়ি বছরেও আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকারগুলি যদি শক্তিশালী সৈন্যদল তৈরি করতে না পারে তার দায় কিন্তু আমেরিকার সরকার এড়াতে পারে না। অধিকন্তু মহিলা-সহ নাগরিকদের অধিকার এবং আইনের শাসন, যা তালিবান জমানায় একেবারেই ছিল না সেটি অনেকাংশে প্রতিষ্ঠিত করার কৃতিত্ব আফগান সরকারের প্রাপ্য। আমেরিকা হঠাৎ একদিন মনে করল যে তাদের অনেক অর্থ খরচ হচ্ছে এবং তাদের সৈন্যদলের প্রাণহানি হচ্ছে। তাই রাতারাতি তালিবানদের ডেকে তাদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করে আমেরিকার পলায়ন— আর যাইহোক, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের নাক গলানোর অভিপ্রায়ে চরম আঘাত করল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক কথা বলি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পেট্রোলিয়াম কেনার টাকা মেটানোর জন্য প্রধান মাধ্যম হলো আমেরিকান ডলার। এটাই তাদের দাদাগিরি। ইরানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ভারত ইরান থেকে তেল আনলে তা ভারতের টাকায় মেটাতে পারে। ইরানের সঙ্গে আমাদের দেশের এই চুক্তির সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা করেছে আমেরিকা। অবশ্যই অন্য যুক্তি সাজিয়ে। এইসব দাদাগিরি এখন বন্ধ হবে। আবার বন্ধু হিসেবে আমেরিকা যে একদম বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাও প্রমাণিত হয়ে গেল। আরও বোঝা গেল যে আমেরিকার কথা ও কাজে স্বচ্ছতার বড়োই অভাব।

এখানে আফগানিস্তানের নাগরিকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী, তাদের পরিচয় ও ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। আফগানিস্তানের মানুষজন সতেরোটির বেশি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এর মধ্যে সংখ্যা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য হলো পাস্তুন, তাজিক, উজবেক, হাজারা, তুর্কমেন ও বালুচ। এই গোষ্ঠীগুলিতে এমন নেতা আছেন যারা

আফগানিস্তানে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠার পিছনে পাকিস্তানের অবদান ও আমেরিকার সরকারের আত্মহনন যেমন দায়ী, তেমনি বেশিদিন যদি তালিবান আফগানিস্তানের মসনদে থাকে তবে তা পাকিস্তানের স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক।

প্রত্যেকেই নিজের নিজের গোষ্ঠীর মধ্যে যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি রাখেন। কিন্তু আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনী এই গোষ্ঠীগুলির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে শুধু তালিবানদের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছে— তাঁরা তালিবানদের হাতেই শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরের নকশা করেছে বলেই মনে হয়। কে এই তালিবান? তালিবান কথাটির অর্থ হলো 'ছাত্র'। তালিবানরা মূলত আফগান হলেও তারা একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীভুক্ত নয়। এদের মধ্যে অল্পসংখ্যক আফগানও থাকতে পারে। এরা বিশেষত পাকিস্তানের এবং অল্প কিছু ক্ষেত্রে ভারতের মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ওয়াহাবি মতের সুন্নি মুসলমান যাদের তৈরি করা হয়েছে দেওবন্দি ইসলামি আন্দোলন এবং সাভরিক সংগঠন ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরা বেশিরভাগই পাস্তুন গোষ্ঠীর। ফলে, এরা ওয়াহাবি সুন্নি অধ্যুষিত পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। ২০১৬ সাল থেকে এদের উচ্চতম নেতা মৌলবি হাইবাতুল্লা আখুন্তজাদা। এদের মধ্যে পাস্তুন ছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক তাজিকও আছে। এদের শিক্ষা, ঐতিহ্য ও চিন্তাধারা জিহাদিধর্মী। এরা ইসলামি মৌলবাদ ও অসহিষ্ণুতার ধারক ও বাহক। এরা বাইরে যতই দেখাক যে আইসিস এদের শত্রু, চিন্তাধারা, ভাবাদর্শ এবং কাজকর্মে কিন্তু তা দেখা যায় না, ভারতের ক্ষতি করা যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য সেই জইশ-ই মহম্মদ ও আল কায়দা এদের বন্ধু। এছাড়া এরা হাক্কানি নেটওয়ার্কেরও ঘনিষ্ঠ। চীন, তুরস্ক, কাতার ও বিশেষত পাকিস্তান এদের আফগানিস্তানের একচ্ছত্র ক্ষমতায় দেখতে চায়। এরা এবার আফগানিস্তানে যে ইসলামি এমিরেটস-এর কথা বলছে, ১৯৯৬ সালে প্রথম ক্ষমতায় এসে এরা একই কাজ করেছিল। ২০০১ সাল পর্যন্ত এদের অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহিলাদের সামান্যতম স্বাধীনতা এরা দেয় না। মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার এরা বিরোধী। হাজার হাজার মানুষ, এদের দ্বারা নিহত হয়। বিশেষত মহিলাদের এরা নির্দয়ভাবে হত্যা করে। ২০০১ সালে আমেরিকা ও ন্যাটো বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে এরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সে সময়ও নর্দার্ন অ্যালায়েন্স পঞ্জশির এলাকায় তালিবানদের রুখে দিয়েছিল। এবারেও তারা একই ভাবে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

তালিবানরা এবারে ক্ষমতায় এসে বলেছে শরিয়তি আইন মোতাবেক এরা দেশ চালাবে! নারী স্বাধীনতাও তারা দেবে শরিয়তি আইন মোতাবেক! কিন্তু এটা বলছে না যে শরিয়তি আইনের ব্যাখ্যা এরা নিজেদের মতো করে করবে। তাই সাধারণ স্বাধীনচেতা আফগান জনগণ এদের বিশ্বাস করছে না। মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর অবস্থানের সময় আফগানদের দেশত্যাগের ঐকান্তিক চেষ্টাই তার প্রমাণ।

তালিবানরা অত্যাচার ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে পারে। কিন্তু একটা দেশকে কী করে শাসন করতে হয় সেটা এদের জানা নেই। যখন প্রথমবার ২০০১ সালে তালিবানরা আফগানিস্তান থেকে বিতাড়িত হলো, তখন এক প্রান্তিক জায়গায় তারা বিদ্রোহী যোদ্ধা হিসেবে আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। এদের রক্ষণাবেক্ষণ, ট্রেনিং ও অন্যান্য

কৌশলগত সাহায্য— সব কিছুই পাকিস্তান জোগায়। এদের বেশিরভাগ মানুষ পাস্তুন হওয়ায় পাকিস্তানেরও সুবিধা হয়। পাকিস্তানের একটা উদ্দেশ্য— তাহলো এদের নেটওয়ার্কের সঙ্গে পাকিস্তান প্রসূত জইশ-ই-মহম্মদ ও অন্যান্য ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলিকে যুক্ত করে ভারত থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান-সহ অন্যান্য নেতা এবং ফৌজিরা সরাসরি সেকথা বলছেও। এই উদ্দেশ্যে এদের সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদার লালন-পালনও পাকিস্তান করছে। এখন পাকিস্তান একারণেই ইসলামিক সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে। এই সন্ত্রাস দমনের জন্য যখন বাইডেন প্রশাসন পাকিস্তানের সাহায্য নেয় তখন মার্কিনিদের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশ্ব-জনমতের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, এই তালিবানরা আফগানিস্তান থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এদের অর্থনৈতিকভাবে মজবুত করার লক্ষ্যে এদের পৃথিবী জুড়ে মাদক চোরাচালানের ব্যবসা ও তোলাবাজির কাজে পাকিস্তান পুরোদস্তুর সহযোগিতা করেছে। এখন তালিবানদের 'ভালো' সার্টিফিকেট দেওয়া এবং বিভিন্ন দেশ, বিশেষত ইসলামিক দেশগুলি যাতে তালিবান সরকারকে মান্যতা দেয়, তার জন্য পাকিস্তান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চোখে পড়ার মতো।

আফগানিস্তানের আশরফ গনি সরকারের অযোগ্যতা ও পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির পর পশ্চিমি দেশগুলির আফগানিস্তান থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার কারণে আফগানিস্তানের অর্থনীতি এখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিদেশি সাহায্য ছাড়া এই অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সম্ভাবনা নেই। আজ তালিবানদের কাছে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ আফগান জনসাধারণের মুখে খাবার জোগানো। এই মুহূর্তে চীন তাদের রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করলেও বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ যে করবে না তা বলাই বাহুল্য। যে জন্য পাকিস্তান দ্বারা প্রতিপালিত তালিবান নেতৃত্ব একাধিকবার ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলে ভারতের চলতে থাকা বিনিয়োগগুলি বন্ধ না করতে অনুরোধ করেছে। এক্ষেত্রেও ভারতকে অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে। কারণ দেশ শাসন সম্পর্কিত তাদের ঘোষিত নীতিই তালিবানদের আধুনিক সভ্য সমাজের কাছে সন্দেহভাজন করে তুলেছে। আবার পাকিস্তান তাদের 'পালক পিতা' হলেও পাকিস্তানের অর্থনীতি এমন যে তাদের নিজেদেরই বিদেশি সাহায্য ছাড়া চলে না। সুতরাং পাকিস্তানের দিক থেকে বিশেষ আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে তালিবান পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের ২৬৭০ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা উন্মুক্ত রাখার পক্ষপাতী যাতে সাধারণ আফগানরা এবং অবশ্যই তালিবানরা পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করতে পারে। তাজিকিস্তানের সঙ্গে ১৩৫৭ কিলোমিটার সীমান্ত থাকলেও তাদের সঙ্গে তালিবানের সম্পর্ক খারাপ। তাছাড়া তালিবান বিরোধী নর্দার্ন অ্যালায়েন্সকে তাজিকিস্তান সাহায্য করছে। এরপর ইরানের সঙ্গে ৯২১ কিলোমিটার সীমান্ত ইরান বন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া তুর্কমেনিস্তানের সঙ্গে ৮০৪ কিলোমিটার ও উজবেকিস্তানের সঙ্গে সঙ্গে ১৪৪ কিলোমিটার সীমান্ত থাকলেও ওই দুই দেশের সঙ্গে তালিবানদের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয়। চীনের সঙ্গে ৯১ কিলোমিটার সীমান্ত থাকলেও চীন নিজের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে পারে। তালিবানের প্রয়োজনে নয়। যদিও পাকিস্তান সর্বদা তালিবানদের প্ররোচিত করবে ভারতবিরোধী কাজের জন্য, তবু তালিবান ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার করেই ভারতে আসতে পারবে। এই মুহূর্তে আফগানিস্তানে তালিবানের যে অবস্থা তাতে অতি বড়ো মূর্খও ভারত আক্রমণের ঝুঁকি নেবে না। সুতরাং ঢালাও আন্তর্জাতিক সাহায্য না পেলে তালিবানের একমাত্র বাঁচার রাস্তা পাকিস্তানকে দোহন করা।

এই আশঙ্কা থেকে পাকিস্তান তাঁর সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমান্তকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সিল করার প্রস্তাব দেয়। তালিবান তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাব নস্যাৎ করে দেয়। তারা যুক্তি দেয়, এতে দু' দেশের সাধারণ নাগরিকদের অসুবিধা হবে। এখানে একটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, সঙ্গে আফগানিস্তানের সীমান্তে বসবাসকারী পাকিস্তানি নাগরিকদের গরিষ্ঠ অংশই পাস্তুন। আবার তালিবানরাও পাস্তুন। ফল, তালিবান তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য পাকিস্তানিদের উপরেই নির্ভর করবে। আর এখানেই রয়েছে পাকিস্তানের মৃত্যুবাণ। কীভাবে?

আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক চাহিদার কিয়দংশ মেটানোর ক্ষমতাও পাকিস্তানের ইমরান খান সরকারের নেই। তালিবান তার শিকার খুঁজবে পাকিস্তানের মধ্যেই। তালিবানের পক্ষে সেটাই সবচেয়ে সহজ ও কম ঝুঁকিপূর্ণ। পাকিস্তান স্বাভাবিক কারণেই তাতে বাধা দেবে। আর তখনই শুরু হবে সংঘর্ষ। এমতাবস্থায় পাকিস্তান হয়তো জইশ-ই-মহম্মদ ও অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভারতে অনুপ্রবেশ ও নাশকতা বৃদ্ধির চেষ্টা করবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভারত সরকারের উচিত শক্ত হাতে এসবের মোকাবিলা করা। প্রয়োজনে বারবার পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ভেঙে দেওয়া ও আইএসআইয়ের ভারত সরকারের সাজেস্টিক সাপোর্ট নেটওয়ার্কগুলি নষ্ট করে দেওয়া। এই সময় আফগানিস্তানের সরকারের সঙ্গে ভারতের চাণক্যনীতি অনুযায়ী সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করা উচিত। চীন পাকিস্তানকে মদত দেয় তার অর্থনৈতিক করিডোর তৈরির জন্য। যখন আফগানিস্তানে চীনের বন্ধু সরকার থাকবে তখন পাকিস্তানের মতো একটি জঙ্গি তোষণকারী দেশের দায় চীন নেবে না।

সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, আফগানিস্তানে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠার পিছনে পাকিস্তানের অবদান ও আমেরিকার সরকারের আত্মহনন যেমন দায়ী, তেমনি বেশিদিন যদি তালিবান আফগানিস্তানের মসনদে থাকে তবে তা পাকিস্তানের স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। এখানে ভারতের বিচক্ষণ ভূমিকা থাকা আবশ্যক।

(লেখক মৌলানা আজাদ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

হরপ্পা সভ্যতায় কথা বলার ভাষা

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

হরপ্পার লোকেরা শিক্ষিত ছিল এটা এই কারণে বলা যায় যে তারা তাদের লেখার নমুনা রেখে গেছে। তার বেশিটাই পোড়ামাটির মোহরের বা অন্যান্য শিল্পকর্মের উপরে ছোটো ছোটো বার্তা হিসেবে পাওয়া গেছে। হরপ্পার বিখ্যাত সব মোহর আছে। প্রথম আবিষ্কারের সময় থেকে ঐতিহাসিকদের লক্ষ্য হচ্ছে এই লিপির পাঠোদ্ধার করা ও ভাষাটা কী ছিল তা চিহ্নিত করা।

পিছনে তাকিয়ে দেখলে একটা কথা বোঝা যায় যে আর্য আক্রমণ তত্ত্ব হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার হওয়ার পর একটা ডগমা বা অন্ধ মতবাদের মতো হয়ে গেছে। এই তত্ত্ব হরপ্পার ভাষা ও তাদের লেখা বোঝার পক্ষে মস্ত বড়ো অন্তরায় হয়ে গেছে। এই আর্য আক্রমণ তত্ত্ব বা সংক্ষেপে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় এআইটি (এর পর আমরা তাই বলব) অনুসারে বলা হয় যে হরপ্পার ভাষা দ্রাবিড় ভাষায় পুরনো রূপ। এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করেছিলেন ফ্রেডরিখ ম্যাক্সমূলার, উইনিলয়াম জোন্স, রিজলে প্রমুখ।

কিন্তু প্রাচীনতম যে তামিল লিপি জানা গেছে তা ২০০০ বছর পুরনো। সে জায়গায় হরপ্পার লিপি ৪০০০ বছরের পুরনো। কাজেই তাদের তামিল হিসেবে পড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যদিও আস্কো পার্পোলার মতো কিছু পণ্ডিত যারা এইসব চেষ্টা করেছেন তামিল রাজনীতিবিদরা তাদের নানাভাবে পুরস্কৃত করেছেন। সেঠনা বা ড. রাজারাম চিহ্নিত করেছেন হরপ্পানরা পরবর্তীকালের বৈদিক সূত্র কালপর্বের। আর তাতেই অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে : এই ভাষাটা বৈদিক সূত্র কালপর্বের আর্কাইক বা প্রাচীন সংস্কৃত হতেই হবে। নটবর ঝাও এই লিপির পাঠোদ্ধারের জন্য যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি ভাষাটাকে বৈদিক সংস্কৃত বলে ধরে নিয়ে এগিয়েছেন। কিন্তু সেঠনাদের গবেষণা এই অনুমানকে যথার্থ প্রমাণ করেছে এবং তার পিছনের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও দিয়েছে। তার দু'বছর পরে তারা 'সিন্ধু লিপির সংকেত উন্মোচন' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

পক্ষপাতদুষ্ট এআইটি তত্ত্বের আলোয় এই মোহরগুলো একপ্রকার কাঁচা হরপ্পা (পড়ুন দ্রাবিড়) লিপিতে লেখা বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কখনো সেগুলোর পাঠোদ্ধার প্রত্যয়যোগ্যভাবে করা হয়নি। কিন্তু রাজারাম আর ঝার মতে 'যে হরপ্পা সভ্যতার অবদান এই লিপি তা বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়কালের। সুত্রের মতো বৈদান্তিক সাহিত্য ও উপনিষদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সূত্র সাহিত্যে যে সূক্তগুলো আছে তা এই লিখন শৈলীর সাক্ষ্য বহন করে। চিত্রকল্প ও প্রতীকি চিহ্ন ভীষণভাবে বৈদিক। তার শব্দভাণ্ডার বৈদিক শব্দাবলী নিরুক্ত নামে

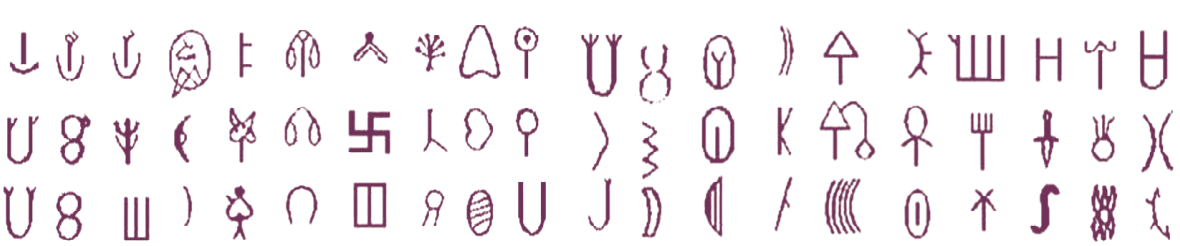

খ্যাত যস্কের টীকার উপর খুব বেশি করে নির্ভর করে। যস্কের নামে কম করেও দুটো, সম্ভবত তিনটে মোহর পাওয়া গেছে। বৈদিক রাজাদের ও ঋষিদের, এমনকী জায়গার নামেরও উল্লেখ আছে। বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো সরস্বতী নদীর উৎস এবং সপ্ত অপহের বা সপ্তনদীর দেশের উল্লেখ।'

এর অর্থ দাঁড়ায় হরপ্পা সভ্যতার সময়ে ঋগ্বেদ যথেষ্ট প্রাচীন হয়ে গেছে। কারণ হরপ্পা সভ্যতা ৩১০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত বিরাজমান ছিল; সুতরাং তার আগে থেকেই ঋগ্বেদের অস্তিত্ব ছিল। এর প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থনও রয়েছে— আর. এস. বিস্ত যখন ধোলাভিরায় প্রাপ্ত বিশাল হরপ্পা নগরের অনুসন্ধান করছিলেন সেই সময়ে অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের সঙ্গে বিস্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সরস্বতী অববাহিকার বৈদিক আর্যরাই হরপ্পার নগরসমূহ সৃষ্টি করেছিলেন এবং এর সঙ্গে জড়িত সভ্যতাগুলোও। এখন এটাও আবিষ্কৃত হয়েছে যে হরিয়ানা, ভারতের পঞ্জাব এবং হিমাচল প্রদেশে খুব ঘেঁষাঘেঁষি স্থানে হরপ্পার অনুরূপ নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল সরস্বতীর তীর বরাবর। সুতরাং এটাকে সিন্ধু সভ্যতার বদলে সরস্বতী সভ্যতা বলা চলে। বড়ো জোর সিন্ধু-সরস্বতী সভ্যতা। সরস্বতীর মজে যাওয়া নদীর খাত নিশ্চিতভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজারামের বিবরণে বলা হয়েছে— ''ব্রাহ্মী লিপি হরপ্পান ভাষার লিপি থেকে এসেছে, ভীষণভাবে তার বর্ণমালার সেট থেকে ধার নিয়েছে। বস্তুত উভয়ের বৈশিষ্ট্যধারণকারী লেখার উদাহরণও আছে। তাই এটাকে যুক্তিসঙ্গতভাবে হরপ্পান লিপি, প্রাচীন ব্রাহ্মী বা প্রোটো ব্রাহ্মী বলা যেতে পারে। এই লিপি উদ্ধার সম্ভব হয়েছে শ্রীঝার মতো একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও প্যালিওগ্রাফারের কুড়ি বছরের গবেষণার ফলে। আগে যেমন বলা হয়েছে শ্রীঝা ও আমি প্রায় ২০০০-এর কাছাকাছি মোহর পাঠ করেছি। এর বেশিরভাগের উল্লেখ আমরা পেয়েছি বৈদিক সাহিত্যে বিশেষত যস্কের নিরুক্তে।

এই থিসিস প্রশ্নাতীত নয়, এ নিয়ে বিতর্ক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারবিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। কিন্তু এর বিরোধীরা, তাদের মধ্যে বামপন্থীই বেশি, নিজেদের স্বপক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য তুলে ধরতে পারেনি। তারা এক নাগাড়ে লেখকদের আদর্শগত ও ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে চেঁচামেচি করেছিল।'' এই আর্য আক্রমণ তত্ত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা, ঔপনিবেশিকদের রটনা, এটাকে বানানো হয়েছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে। 'ধূর্ত' আর্যদের দ্বারা 'দ্রাবিড়ি' সভ্যতার উপর 'আক্রণণে'র কোনো সম্ভাবনাই নেই।

কোয়েনার্ড এলস্ট লিখেছেন, রাজারামের এই পাঠোদ্ধারের একটা মর্ম হলো এই যে হরপ্পান ও এমনকী প্রাক্-হরপ্পান সমাজসমূহের লোকজন বৈদিক ভাষায় কথা বলত এবং তারা বৈদিক মন্ত্রের সমসাময়িক।

আর একটা মজার ব্যাপার হলো, অষ্টাদশ শতকের জ্যোতির্বিদ জন প্লেফেয়ার বলেছিলেন যে হিন্দুদের ব্যবহৃত জ্যোতির্বিদ্যার সারণিগুলো অন্য যে কোনো জায়গায় ব্যবহৃত সারণির তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। তাঁর মতকে খ্রিস্টধর্মের অস্তিত্ব বা তাদের টিকে থাকার পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করা হয়েছিল। তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন যে হিন্দুদের ব্যবহৃত জ্যোতির্বিদ্যার সারণি কলিযুগ নামে খ্যাত এক যুগান্ত থেকে আরম্ভ হয়েছে। এটা বর্তমান যুগের থেকে মানে খ্রিস্ট যুগের থেকে ৩২০২ বছর আগে শুরু। তিনি একাধারে গণিতবিদ ও ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন; তিনি নানান ধরনের জ্যোতির্বিদ্যার সারণি অধ্যয়ন করেছিলেন। বস্তুত সেসব ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে যেহেতু ব্রাহ্মণদের জ্যোতির্বিদ্যা কলিযুগের প্রারম্ভে খুবই নিপুণ ছিল, তাই অবশ্যই এই তারিখের অনেক আগে এর উৎস লুকিয়ে আছে।

''তিরভালোরের সারণিগুলো, যদিও তারা পূর্বে বর্ণিত সারণিগুলোর থেকে আকারে অনেক আলাদা, তাদের অনেক উপাদানের সঙ্গে সেগুলো মিলে যায় পুরোপুরি। তারা মনে করে বছরের একই দৈর্ঘ্য, একই গড় গতি এবং সূর্য ও চাঁদের একই বৈষম্য এবং তারা প্রায় একই মেরিডিয়ানের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে তাদের আলাদা মনে হয় সেই সময় অর্থাৎ খ্রিস্টের জন্মের ৩১০২ বছর আগে থেকে কলিযুগ শুরু হয়। অতএব আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, এই যুগটি আসল নাকি কাল্পনিক অর্থাৎ এটি প্রকৃত পর্যবেক্ষণ করা, না অন্যান্য জাতির জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে ধার করা, না নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত যুগের কল্পনা করা হয়েছে, যা কলিযুগের উদ্‌যাপিত যুগের সঙ্গে মিলে যায়; অহংকার বা কুসংস্কারবশত তারা মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্থানসমূহ উল্লেখ করেছে এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা যা দেখেছিল বলে তারা ভান করে তাই তারা কেবল গণনা করেছে। এবং... এটা করতে গিয়ে ব্রাহ্মণরা নিশ্চয়ই আমাদের তাদের ভণ্ডামি শনাক্ত করার অব্যর্থ উপায় হাতে তুলে দিয়েছে। মহাকাশের জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে— ছেচল্লিশ শতাব্দী আগে যতটা সম্ভব নিখুঁতভাবে জ্যোতিষ্কগুলোর অবস্থান যাচাই করার বিষয়। যদি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সাহায্য না পেত এবং একশো বছর ধরে অবিরাম প্রচেষ্টার পরে ইন্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস যদি না আমাদের এই সৌর ব্যবস্থায় গ্রহগুলোর নিজেদের মধ্যেকার পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে যেসব অস্থিরতা বিরাজ করে তা নিখুঁতভাবে বার করত তাহলে টেলিস্কোপ এবং পেন্ডুলাম থেকে ইউরোপের আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, যে এত নির্ভুলভাবে সব বার করেছে তা করতে পারত না।''

প্লেফেয়ার বলেছে যে হিন্দুদের অত্যন্ত উন্নত গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রাচীনকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির নিদর্শন, ''তখন সমস্ত ইউরোপ বর্বর বা মনুষ্যবসতিহীন ছিল; যদি তার প্রায় পাঁচ হাজার বছর পরে ইউরোপে মহাকর্ষের সূক্ষ্মতম ফলাফলের উপরে নানা গবেষণা একে অপরের সহায়তায় না আসত তবে সেটা তারা করতে পারত না। সেই সময়ে ভারতে সেইসব পর্যবেক্ষণ হয়েছিল। এটা মানবজাতির ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের এবং নানান ওলটপালটের সম্পর্কে যত উন্নতি হয়েছে তার সম্ভবত সবচেয়ে আকর্ষণীয় উদাহরণ।''

তিনি হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত জ্যোতির্বিজ্ঞান সারণিগুলোর বিভিন্ন পরামিতি কঠোরভাবে যাচাই করেছিলেন, যার মধ্যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বছরের দৈর্ঘ্য, সূর্যের কেন্দ্রের সমীকরণ এবং গ্রহনক্ষত্রের তির্যক গতিপথ সব অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর মতে, এই সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে, হিন্দুদের দ্বারা সৌর বছরের নির্ণয় কলিযুগের ১২০০ বছর আগে বা খ্রিস্টীয় যুগের আগে ৪৩০০ বছর আগের মতো প্রাচীন।

১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে যদি এই 'আক্রমণকারী' ব্রাহ্মণরা না থাকত, তাহলে প্লেফেয়ার কথিত ৪৬০০ বছরের পুরনো সারণিগুলি কে তৈরি করেছিল? □

বিধান পরিষদ প্রতিনিধিত্বমূলক না হলে সেটা অগণতান্ত্রিক

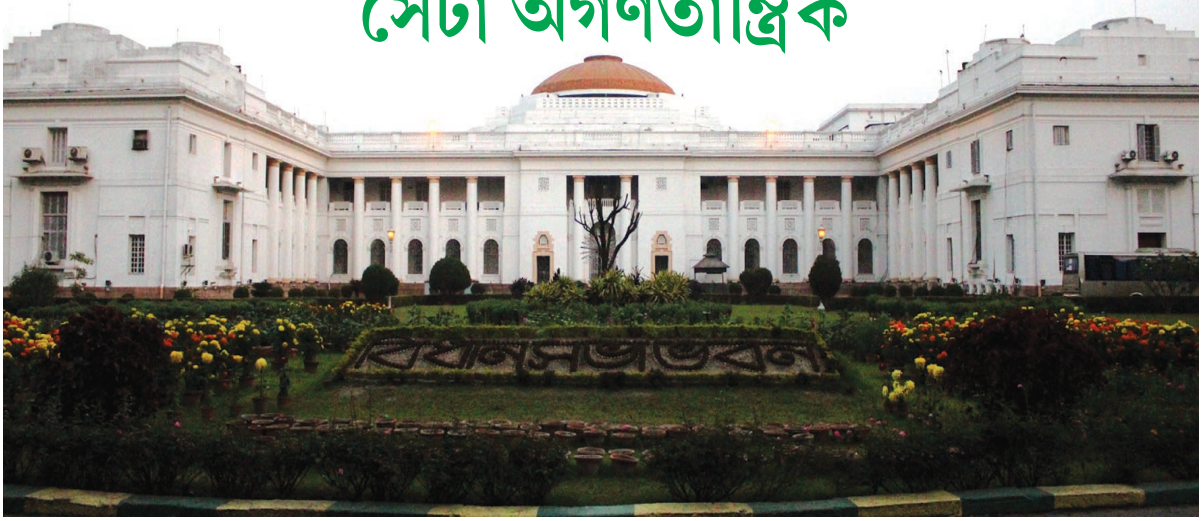

ড. সুজিত রায়

ভারতীয় সংবিধানের ১৬৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্যের ভোটারদের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত একটি বিধানসভা থাকতেই হবে এবং ঐচ্ছিক হিসেবে পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত এক বিধান পরিষদ থাকতে পারে। অনেকে মনে করেন, বিধানসভা কেন্দ্রীয় ভাবে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভার মতো; আর বিধান পরিষদ অনেকটা সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার মতো। বর্তমানে সারা ভারতে মাত্র ছয়টি রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে। এগুলি হলো : অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, বিহার ও উত্তর প্রদেশ।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সংবিধানের ১৬৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠন করার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই রাজ্যে ১৯৫২ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত একটি বিধান পরিষদ ছিল। বর্তমান মমতা ব্যানার্জি সরকার পুনরায় সেই বিধান পরিষদ তৈরি করার জন্য প্রস্তাব পাশ করেছে; যদিও সেই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি। বিধানসভার একমাত্র বিরোধী দল বিজেপি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

এখন কিছু মূল প্রশ্ন : বিধান পরিষদকে কি রাজ্যসভার রেপ্লিকা বলা যায়? এই পরিষদ কি রাজ্যস্তরে প্রতিনিধিত্বমূলকতা মেনে তৈরি হয়? এই বিধান পরিষদ কতটা জরুরি? এই ইস্যুগুলি নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

প্রাচীনকালের মতো প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নীতি মেনে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা আজকের সময়ে অবাস্তব। আজকের পরিস্থিতিতে তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় পরোক্ষভাবে, যার ভিত্তি ভূমি হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, যেখানে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। ভারতেও এই শাসনব্যবস্থাই গৃহীত হয়েছে। গঠনগত ভাবে ভারত রাষ্ট্র একটি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় একীভূত সত্তা' (ফেডারাল ইউনিয়ন), যার দ্বিকক্ষীয় সংসদ আছে— সরাসরি ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত নিম্নকক্ষ 'লোকসভা' এবং পরোক্ষভাবে রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত উচ্চকক্ষ 'রাজ্যসভা'। যদিও ভারত রাষ্ট্র তার 'রাজ্যগুলির ইউনিয়ন', কিন্তু ভারতের রাজ্যগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলির মতো নয়। কারণ, আমেরিকার রাজ্যগুলির মতো কোনো চুক্তিবদ্ধ নীতির মাধ্যমে ভারত রাষ্ট্র তৈরি হয়নি। ভারতের রাজ্যগুলি কোনো অপরিবর্তনীয় কাঠামোগত সত্তা নয়। তাছাড়াও ভারতীয় সংসদের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে রাজ্যগুলির সীমানা পরিবর্তন করার, এক বা একাধিক রাজ্য ভেঙে বা জোড়া দিয়ে নতুন রাজ্য গঠন করার। এছাড়াও ভারতীয় নাগরিকত্ব একক,

> "সংবিধান তৈরির সময় বিধান পরিষদের যা কিছু প্রাসঙ্গিকতা ছিল, আজকের সময়ে তা আর নেই; এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা এখন অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

যুক্তরাষ্ট্রের মতো দ্বৈত নয়!

তবে, যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি মেনে ভারতীয় সংবিধানের রূপকারগণ রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজ্যসভার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বিধান পরিষদকে কখনোই রাজ্যসভার রেপ্লিকা হিসাবে দেখা যায় না। তার অনেক কারণ আছে। জনসংখ্যার অনুপাতে গঠিত রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের ভোটে রাজ্যসভা গঠিত হয়েছে; যদিও বিধান পরিষদের সদস্যরা সেই নীতির উপর ভিত্তি করে নির্বাচিত হন না। রাজ্যসভার কক্ষের প্রতিনিধিনিত্বমূলকতার ভিত্তিভূমি হচ্ছে রাজ্য। বিধান পরিষদের কক্ষের এরকম কোনো ভিত্তিভূমি নেই। আবার, রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বিধান পরিষদ কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয়, ভারতীয় সংসদ এই প্রতিষ্ঠানকে ১৬৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তৈরি বা অবলুপ্ত করতে পারে। এখানেই একটি মূল প্রশ্ন : রাজ্য বিধানসভার গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের সংসদ কি 'বাধ্যতামূলক' ভাবে বিধান পরিষদকে তৈরি/অবলুপ্ত করতে পারে?

শুধু তাই নয়, ১৭১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভারতের সংসদ সাধারণ আইন তৈরি করে বিধান পরিষদের গঠনগত পরিবর্তন করতে পারে, যা বিশেষ ভাবে সংবিধান সংশোধন না করে রাজ্যসভার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আবার, রাজ্যসভার ক্ষমতার সঙ্গে বিধান পরিষদের ক্ষমতার তুলনাই হয় না। যদিও অর্থ বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের কোনো ক্ষমতা নেই। এছাড়াও সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার যে ভূমিকা আছে, বিধান পরিষদের সে ক্ষমতাও নেই। কারণ কোনো বিল রাজ্য বিধানসভা যদি দ্বিতীয়বার পাশ করে, তবে বিধান পরিষদের কোনো ক্ষমতাই নেই সেই বিলকে কোনো ভাবে আটকে রাখার বা পাশ না করার। রাজ্যসভাকে লোকসভার প্রায় 'সমান' ক্ষমতা-সম্পন্ন বলাই যায়; কিন্তু রাজ্য বিধান পরিষদকে কোনো ভাবেই বিধানসভার সমান বলা যায় না। শেষে এটাও বলতে হয় যে, সংবিধান

সংবিধান সংশোধন করে হয় বিধান পরিষদ ব্যবস্থাকে বাতিল করা দরকার, নতুবা এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বার্থে প্রতিনিধিত্বমূলক করে তোলা দরকার যার ভিত্তিভূমি হবে জেলা ও অন্যান্য ভৌগোলিক এলাকা।

সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার যে ক্ষমতা আছে, বিধান পরিষদের তার বিন্দুমাত্র নেই। তাই বিধান পরিষদ কোনো ভাবেই রাজ্যস্তরে রাজ্যসভার রেপ্লিকা নয়।

এখন আরেকটি গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন : রাজ্যস্তরে বিধান পরিষদ প্রতিনিধিত্বমূলকতার নীতিকে কতোটা মেনে চলে? এটা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি যেন রাজ্যগুলির সীমানাতেই শেষ হয়েছে। রাজ্যের অভ্যন্তরে বিধান পরিষদ কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি মেনে তৈরি হয় না। অর্থাৎ জেলাগত বা কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকার প্রতিনিধিত্ব বিধান পরিষদে হয় না। বিভিন্ন ধরনের নির্বাচকমণ্ডলী যেমন, বিধায়কমণ্ডলী, স্থানীয় স্বশাসিত বোর্ডগুলি, স্নাতকমণ্ডলী, শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা বিভিন্ন অনুপাতে নির্বাচিত সদস্য ও রাজ্যপালের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে বিধান পরিষদ গঠিত হয়, যার কোনো যুক্তিসঙ্গত প্রতিনিধিত্বমূলককতা নেই। বিধান পরিষদের গঠন রাজ্যের অধিবাসীদের সাপেক্ষে নিশ্চিতরূপে এক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিধান পরিষদ কতোটা প্রয়োজনীয়? জনগণের অর্থ দিয়ে এই ধরনের অগণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে চালু রাখা বা নতুন করে তৈরি করা কতোটা প্রয়োজনীয়? বিধান পরিষদের অকার্যকারিতা এতোটাই প্রকট যে, এই ব্যবস্থা সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয়ের একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবিধান তৈরির সময় এই প্রতিষ্ঠানের যা কিছু প্রাসঙ্গিকতা ছিল, আজকের সময়ে তা আর নেই; এই সাংবিধানিক ব্যবস্থা এখন অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলকতার পরিপন্থী এই ব্যবস্থা এখন যে কোনো শাসক দলের কাছে এক রাজনৈতিক কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে; যা আমরা দেখলাম পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক সুবিধাবাদ এখানে শাসক দলের প্রধান অস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

তাই এখনই সেই সময়, যখন বিধান পরিষদ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে এক সাহসিক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে এক সার্বিক রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলা দরকার। সংবিধান সংশোধন করে হয় বিধান পরিষদ ব্যবস্থাকে বাতিল করা দরকার, নতুবা এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বার্থে প্রতিনিধিত্বমূলক করে তোলা দরকার যার ভিত্তিভূমি হবে জেলা ও অন্যান্য ভৌগোলিক এলাকা। সংবিধানের ১৭১ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিধান পরিষদের সদস্যতার ক্ষেত্রে এক নতুন আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা সংসদের আছে। তবে ভারতের মতো এক ভাইব্রান্ট গণতন্ত্রে বিধান পরিষদের মতো এক অগণতান্ত্রিক অচল ব্যবস্থাকে অবলুপ্ত করাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

With Best Compliments from :

A Well Wisher

আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রশাসন দুর্নীতিমুক্ত করা অসম্ভব

মণীন্দ্রনাথ সাহা

খবরে প্রকাশ, ২০১৪ সালের প্রাইমারি টেট মামলায় ছটি প্রশ্নে বিভ্রান্তি ছিল। সেই প্রশ্নগুলো যদি কেউ 'অ্যাটেম্পট' করে তাহলে তাকে নম্বর দিতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৪ সালের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ২০১৫ সালে পরীক্ষা হয়। কিন্তু প্রশ্নপত্রে ছটি প্রশ্ন ভুল ছিল। তখন হাইকোর্টের বিচারপতি সমাপ্তি চট্টোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর যদি কেউ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন, তবে তাঁকে নম্বর দিতে হবে বলে নির্দেশ দেন। নম্বর দেওয়ার পরে ফের মেধাতালিকা প্রকাশ করে ওই প্রার্থীদের নিয়োগ বিবেচনা করতে হবে বলে আদালত জানিয়েছেন।

অভিযোগ, আদালতের সেই নির্দেশ অমান্য করেছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। ওই প্রার্থীরা এখনও নিয়োগপত্র পাননি। সম্প্রতি এই মামলার শুনানি ছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। ওইদিন আদালত অবমাননার দায়ে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন— প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্যকে জরিমানা বাবদ ১৯ জন প্রার্থীকে ২০ হাজার টাকা করে মোট তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা নিজের পকেট থেকেই দিতে হবে। উপরন্তু আগামী সাতদিনের মধ্যে মামলাকারী পরীক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট ৬ প্রশ্নের নম্বর দিতে হবে এবং সাতদিনের মধ্যেই মামলাকারীদের নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ওইদিন হাইকোর্টে বিশ্বভারতীর অচলাবস্থা কাটানোর মামলাতেও হাইকোর্ট ছাত্র ইউনিয়নের কর্তাদের ধমক দিয়ে বলেছে— এটা ছাত্র ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন

নয়। পুলিশকে কড়া নির্দেশের ফলে পুলিশ দৌড়াচ্ছে আর নবান্ন নীরব দর্শক সেজে বসে আছে।

একইদিনে সুপ্রিম কোর্টেও রাজ্য সরকার থাপ্পড় খেয়েছে। কেননা রাজ্য সরকার ইউপিএসসি-কে এড়িয়ে ডিজিপি নিয়োগ করতে চেয়ে আবেদন করে সুপ্রিমকোর্টে। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারকে সুপ্রিম কোর্ট আর এক থাপ্পড় মেরে বলেছে— 'এসব বন্ধ করুন।'

এই খবরগুলো পড়ে মনে পড়ে গেল পুরনো দিনের এক গ্রাম্য প্রবাদের কথা। তা হলো— মা ছেলেকে বলছেন— 'চল্ বাবা বাড়ি যাই'। তার উত্তরে ছেলে মাকে বলছে— 'একটু দাঁড়াও মা, কুত্তামানটা খেয়ে যাই।'

রাজ্য সরকারেরও ঠিক একই অবস্থা। একজনের অনুপ্রেরণায় সংবিধানে কোনো নিয়মকানুনকে মান্যতা দেয় না আমলারা। তার ফলে রাজ্য সরকার পদে পদে আদালতের চড়-থাপ্পড়, কানমলা খেয়ে চলেছে নির্লজ্জের মতো। তবু লজ্জা হচ্ছে না।

বর্তমানে রাজ্যে যা অবস্থা চলছে তাতে আদালতকে হাল ধরে রাজের কোনো একজনের খামখেয়ালিপনা রদ করে জনসাধারণকে একটু স্বস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আদালত কড়া হলে পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্তারা ভয়ে সঠিক পথে চলতে বাধ্য হবে। তারই দুটি উদাহরণ তুলে ধরলাম।

বহুদিন আগে কর্ণাটক রাজ্যের স্বাস্থ্যদপ্তরে গাফিলতিতে এক বক্তির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। তারপর তিনি কর্ণাটক হাইকোর্টে মামলা করলে হাইকোর্ট সবকিছু ক্ষতিয়ে দেখে স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেক্টরকে নির্দেশ দেন ওই ব্যক্তির সমস্ত পাওনা টাকা সুদ-সহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিটিয়ে দিতে। কিন্তু ডিরেক্টর আদালতের রায় উপেক্ষা করেন। নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর মামলাকারী পুনরায় হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা করেন। আদালত শুনানীর দিন ধার্য করে স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টরকে শুনানির দিন

সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দেন। সেই মতো শুনানির দিন আদালত ডিরেক্টরকে প্রশ্ন করেন--- 'আপনি আদালতের নির্দেশ পালন করেননি কেন?'

ডিরেক্টরের উত্তর— 'মন্ত্রীর নির্দেশে।'

—'মন্ত্রীর নির্দেশের প্রমাণ দিন।'

—'মন্ত্রী মৌখিক নির্দেশ দিয়েছেন, লিখিত দেননি।'

—'মৌখিক নির্দেশের কোনো মূল্য নেই।' এরপর বিচারক ওই ডিরেক্টরকে কারাগারের নির্দেশ দেন।

ঠিক একই কারণে কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি মামলা করেন। মামলার কারণ স্বাস্থ্যদপ্তরের বহু বিভাগের কাজ চলত ভাড়া বাড়িতে। এক ভদ্রলোকের বাড়ি সেসময় স্বাস্থ্যদপ্তরকে ভাড়া দেওয়া ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্যদপ্তর দীর্ঘদিন বাড়িভাড়া পরিশোধ না করায় বাড়ির মালিক পাওনা ভাড়ার জন্য আদালতের আশ্রয় নেন। দীর্ঘদিন মামলা চলা এবং বকেয়া ভাড়া মিলে হাইকোর্টে শুনানির দিন প্রাপ্য ভাড়ার অঙ্ক দাঁড়ায় ৪৫ লক্ষ টাকা। হাইকোর্ট নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে বাড়ির মালিকের পাওনা টাকা পরিশোধ করার নির্দেশ দেন স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেক্টরকে। এই নির্দেশের পরেই ডিরেক্টর বাড়ির মালিকের নামে ৪৫ লক্ষ টাকার চেক্ লেখেন। চেক্ সই-এর আগে কোনো কারণে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তা জানতে পেরে ডিরেক্টরকে বলেন— 'একসঙ্গে এতটাকা বাড়িভাড়া দেবেন না।'

ডিরেক্টর বলেন— 'আদলতের নির্দেশ অমান্য করা যায় না।'

মন্ত্রী— আমি বলছি আপনি একসঙ্গে সম্পূর্ণ টাকা দেবেন না।'

ডিরেক্টর— 'আপনি আমাকে লিখিত নির্দেশ দিন।'

মন্ত্রী— 'আমাকে আপনি বিশ্বাস করেন না?'

ডিরেক্টর— 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আমি কর্ণাটকের স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেক্টর হতে চাই না।'

এই মন্তব্য করার পর তিনি লিখিত চেক্টি সই করে প্রাপকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। একেই বলে 'ঠ্যালার নাম বাবাজী।'

বামফ্রন্টের শাসনকাল থেকে দীর্ঘদিন ধরে এরাজ্যে দুর্নীতি আর সরকার যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার দুর্নীতি দূর করতে আগ্রহী নয়। এ অবস্থায় সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থাকে এগিয়ে এসে প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে। এ রাজ্যের শাসক ক্ষমতার দম্ভে বরাবরই কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করে না। আর সমস্ত দুর্নীতি আর অপকর্মগুলো করায় পুলিশ আর প্রশাসনকে দিয়ে। কাজেই পুলিশ বা প্রশাসন যদি কোনও সময় মানুষের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে মদত দেয় বা তারা অন্যায় করে এবং তার বিরুদ্ধে মামলা হলে আদালত যদি সেই দোষী ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করে তবেই রাজ্যে শান্তি ফিরে আসতে পারে।

এর প্রমাণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই— ভোট পরবর্তী হিংসায় যারা সক্রিয় অংশ নিয়ে মানুষকে গৃহছাড়া করেছিল এবং শাসকের পছন্দের লোক হওয়ায় আইনের ঊর্ধ্বে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারাই এখন সিবিআইয়ের ভয়ে নিজেরাই গৃহ ছেড়ে পালাতে পথ পাচ্ছে না।

সম্প্রতি টেট্-এর ভুল প্রশ্ন মামলায় আদালতের থাপ্পড়ে পর্ষদ সভাপতির গাঁটের টাকা মামলাকারীদের দেবার পর অন্যান্য আমলা বা পুলিশরাও আদালত অবমাননার আগে অন্তত দু' একবার ভাববে। আর এতে শাসকের চাটুকারিতা করার প্রবণতাও কমবে। কাজেই এরাজ্যকে দুর্নীতিমুক্ত এবং হিংসামুক্ত করতে হলে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির মামলায় তদন্তের জন্য রাজ্যের বিরোধিতা সত্ত্বেও সিবিআই তদন্তের নির্দেশ আদালতের তত্ত্বাবধানে রেখে এবং আমলাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ আদালত গ্রহণ করলে তবেই পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে, নচেৎ নয়। □

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

আলোর বৃত্তের অন্ধকারে শিক্ষক দিবসের রাধাকৃষ্ণন

ভারতের বহু মনীষীর জীবনযাত্রায় দেখা গেছে যে, তাদের কষ্টার্জিত ফল আলোকিত হলেও, তাঁরা অনালোকিত থেকে গেছেন। তেমনি আবার মনীষীর আলোকছটায় সমাজ উদ্ভাসিত হলেও, তাদের অনেক অন্ধকার দিক আলোর পিছনেই রয়ে গেছে। এ ইতিহাস বেশ বড়ো। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু, কে. এস. কৃষ্ণান, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বা হালে বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর মতো এক দিকে যেমন অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানী আছেন, ঠিক তেমনি চিকিৎসক বিজ্ঞানী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও রয়েছেন। আবার স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরামের অন্যতম সহযোগী ডমন হেমব্রমও রয়েছেন। যেদিন ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়, সেদিনই ডমন হেমব্রমকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। বোমা তৈরির অন্যতম কারিগর হলো এই ডমনই।

শিক্ষক দিবসের ভাবনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে গুরুপূর্ণিমা নামে খ্যাত। তবু কতিপয় হুজুগে ছাত্র উৎসাহী হয়ে ১৯৬২ সালে সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের কাছে যান তারই জন্মদিনটাকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করার অনুমতি চাইতে। তিনি এই দিনটিকে আরও অনেক বেশি স্মরণীয় করে রাখতে প্রকারান্তরে প্রস্তাব দেন, সমগ্র সমাজের শিক্ষক দিবসের ভাবনার যেন প্রতিফলন ঘটে এই দিনে। এই বিশ্বখ্যাত দার্শনিকের সেদিন গুরুপূর্ণিমার কথা মনে আসেনি।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এই রাধাকৃষ্ণন। যদিও তার বাবা তাকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখতেন, তার মাকেও সন্দেহ করতেন। একসময় রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। রাশিয়ায় সম্ভবত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে ভারতে এসে তিনি বলে ফেলেন, তিনি এক চমকপ্রদ সংবাদ এনেছেন। নেহরুর সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি চুপসে যান, যদিও এর পরেই ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হন। সত্য কথা অন্ধকারেই রয়ে যায়। এর আগে অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকার সময় তার এক অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র যদুনাথ সিংহের ইন্ডিয়ান ফিলজফি গ্রন্থ থেকে অনেক তথ্য নিয়ে তিনি তাঁর গবেষণা পত্র ব্রিটেন থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এর জন্য কৃতজ্ঞতা পর্যন্ত প্রকাশ করেননি ছাত্র যদুনাথ সিংহের কাছে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালতে যায় ১৯২০ সালের ২২ আগস্ট। যদুনাথের কুড়ি হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের মামলার প্রতিবাদে রাধাকৃষ্ণনের এক লক্ষ টাকার মামলা। আসরে নামেন উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

যদুনাথ সিংহকে কিছুটা চাপ দিয়ে আদালতের বাইরে মীমাংসা করা হয়। মীমাংসার শর্তের কথা আজও অজানা রয়ে গেছে। তেমনই অজানা রয়ে গেছে রাধাকৃষ্ণনের বেতনের টাকার কিছুটা, কেনই বা উপাচার্য রাধাকৃষ্ণনের মায়ের নামে পাঠাত। এহেন আলো আঁধারের রাধাকৃষ্ণন কিন্তু রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন দশ হাজার টাকা বেতনের মধ্যে মাত্র আড়াই হাজার টাকা নিতেন, বাকিটা সরকারি তহবিলেই দান করতেন। আর তার জীবনের অন্ধকার দিকগুলো আলোতে না এনে গুজবেই রেখে দিলেন, যা সত্য মিথ্যার বাইরে।

—**রাধাকান্ত ঘোড়াই,**
ডাবুয়াপুকুর, পূর্ব মেদিনীপুর।

ভারতীয় অর্থনীতির অমৃতের পথে যাত্রা

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের গত আর্থিক বর্ষের (২০২০-২১) মোট লাভের পরিমাণ এক লক্ষ কোটি টাকার কিছু বেশি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক পাঁচ বছর পরে লাভের মুখ দেখল এবং এর পরিমাণ প্রায় ৩৩০০০ কোটি টাকা, যেখানে আগের অর্থবর্ষে ক্ষতির পরিমাণ ঠিক এতটাই ছিল। বাঙ্গলার যে সাংবাদিকরা নির্মলা সীতারামন কিংবা শক্তিকান্ত দাসের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করে লম্বা চওড়া প্রবন্ধ লিখেছিলেন গত অর্থবর্ষের প্রথমে, তাঁরা যথারীতি নির্বাক। কারণ তাদের পাঠকরা দেশ ডুবছে শুনে যতটা আনন্দ পান, দেশ উন্নতি করছে জানলে ততটাই দুঃখ পান। বরং তালিবান, পাকিস্তান, চীনের সম্পর্কে কোনো সুখবর দিলে তাঁদের পত্রিকার বিক্রি বাড়ে। এখন প্রশ্ন হলো, পাঁচ বছর পর হঠাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক লাভের মুখ দেখলো কীভাবে এবং এই পাঁচ বছর দেখেনি কেন?

২০১৬ থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি লাভের মুখ দেখা বন্ধ করে দেয়, তাঁর মূল কারণ ভারত সরকারের গত দশ বছরের অন্যতম বড়ো আর্থিক সংস্কার। ইন্সলেভন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড ২০১৬। এই বিল মূলত কোম্পানি বন্ধ করার বিল, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেকশন ১১-এর দেশীয় সংস্করণ। ২০১৬-র আগে আমাদের দেশের বহু 'স্বদেশি ব্যান্ড কোম্পানি ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিয়ে সেই টাকা মেরে দেবার জন্য কোম্পানিকে এনপিএ-কে যথারীতি শূন্য দেখাতো। অথচ সাধারণ মানুষ একমাস বাড়ি বা গাড়ির লোন না দিতে পারলে, ব্যাঙ্ক তাঁর বাড়ি বা গাড়ি কেড়ে নিত। পশ্চিমবঙ্গে ৬০০০০-এর উপর কারখানা বন্ধ হয়েছে গত পাঁচ দশকে। একসময় জ্যোতিবাবুর মস্তিষ্কপ্রসূত এবং বংশগোপাল চৌধুরী লালিত শিল্পপুনর্গঠন দপ্তরের গ্যারান্টিতে এর বহু কারখানা বাঁচাতে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার কোটি ধার নিয়েছে বহু 'স্বদেশী' শিল্পপতি। কিন্তু না খুলেছে কারখানা, না কেউ ব্যাঙ্ককে টাকা ফেরত দিয়েছে, না কেউ দেশ থেকে পালিয়েছে। দিব্যি সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সল্টলেক বা নিউ আলিপুরের প্রাসাদে আজও তাঁরা সুখে বাস করছেন। কিন্তু ২০১৬-তে এই আইবিসি কোড আসার পরে নীরব মোদী, মেহুল চোকসি কিংবা বিজয় মালিয়া পালালো কেন? অনিল আম্বানি, রুইয়ারা সব বকেয়া ফেরত দিল কেন? দেশের একজন বড়ো শিল্পপতি আত্মহত্যা করলো কেন? কারণ তাদের লোন WRITE OFF করে তাদের

ফঃ ৩

বিরুদ্ধে সরকার আইবিসি আইনে মামলা করে। আর বাঙ্গলার খবর এটাকে পেশ করে WAIVE OFF হিসেবে। কারণ দুটি শব্দেরই বাংলা প্রতিশব্দ 'ছাড় দেওয়া'।

তাঁর সঙ্গে আনা হয় কিছু ব্যাঙ্কিং সংস্কার। বহু ব্যাঙ্ককে জুড়ে দেওয়া হয়। ধার দেওয়ার নিয়মে এমন কিছু পরিবর্তন আনা হয় যে নেতা বা বাবুদের ফোনে ধার দেওয়ার দিন শেষ হয়ে যায়। তাঁর উপর গত বছর লকডাউন শুরু দিতেই আরবিআই-এর মোরাটোরিয়াম সিদ্ধান্ত এবং নির্মলাজীর ২০ ট্রিলিয়ন আর্থিক প্যাকেজ। কেন্দ্র সরকার ২০১৯-এ ব্যাঙ্কিং রেগুলেটরি বিল এফআরডিআই আনার চেষ্টা করে, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আরও মজবুত করার জন্য। কিন্তু ব্যাঙ্ক ইউনিয়ন এবং তাঁদের অনুপ্রেরণা দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলির বাধায় রাজ্যসভায় সেই বিল আটকে যায়। আগামীদিনে সরকার আরও কড়া রেগুলেটরি বিল এফএসডিআর আনতে চলেছে।

জিএসটি, আইবিসি, আরইআরএ, এফএসসিআই... এককথায় কলিযুগে ভারতবর্ষের অর্থ ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় এক সমুদ্রমন্থন। বিষ এসে গিয়েছিল। এবার অমৃতের পালা। ২০ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের রেকর্ড লাভ এবং রেকর্ড ফরেক্স রিজার্ভ দিয়ে অমৃতের পথে যাত্রা শুরু। বিষ আসার খবর বাংলা সংবাদপত্র দিয়ে এসেছে। অমৃতের সময় নির্বাক।

—**নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন অচার্য,**
কলকাতা।

কলিযুগের 'দধীচি' ছাগল

খনার বচনে আছে— 'কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ, দধির অগ্র ঘোলের শেষ।' —হলো সুস্বাদু। ভোজন রসিক বাঙ্গালি তথা বিশ্বের মানুষের কাছে কচি পাঁঠা বা ছাগলের মাংসের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে বাঙ্গলার কালো ছাগলের চাহিদা রয়েছে বিশ্বজুড়ে। চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকায় ছাগলের মাংসের দাম প্রতিনিয়তই বাড়ছে। আর সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই অনেক মানুষ ছাগল পালনে এগিয়ে আসছেন। মানুষের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে 'ফার্মলোর' হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের পক্ষ থেকে আজ একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন— 'Officer-in-Charge, Kotulpur Goat Cum Fodder Fam (Govt. of W.B.)'-এর বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক ডাঃ শরদিন্দু শীল।

ডাঃ শীল জানান যে, প্রাণী সম্পদ পালন বর্তমানে অর্থনৈতিক ভাবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে প্রচুর মুনাফা আয় করা যেতে পারে। বেকার যুবক-যুবতীরা সামান্য মাইনের চাকরির পেছনে না ছুটে যদি ফার্ম তৈরি করে ছাগল পালন করেন তাহলে বাৎসরিক অনেক টাকা রোজগার করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রজাতির ছাগল পালন করা যায় বলে ডাঃ শীল জানান। বাঙ্গলার কালো ছাগল, বীটাল, শিরোহী, যমুনাপারি প্রভৃতি জাতের ছাগল আমাদের রাজ্যে পালন করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে বাঙ্গলার কালো ছাগলের মাংস সুস্বাদু হবার কারণে এর চাহিদা ভীষণ কম।

হাইব্রিড নেপিয়ার, খিন নেপিয়ার, জোয়ার, ভুট্টা, সিগনাল, প্যারা, গিনি, দীননাথ, কলমি প্রভৃতি উন্নত প্রজাতির ঘাস ছাগলের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গম, ভুট্টা, মুগ-মসুর, ছোলা গুঁড়ো, মাঈলো গুড় ইত্যাদি ছাগলের খাবার তালিকায় রাখা উচিত বলে ডাঃ শীল জানান। বট, কাঁঠাল, নীম, অশোক, বাবলা, সজিনা পাতা ছাগলের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য, যা অত্যন্ত পুষ্টিকর। সবুজ ঘাসের অপ্রতুলতা প্রাণী-সম্পদ তথা ছাগল পালনে বিশেষ অসুবিধার কারণ হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি জানান।

ছাগল পালন করে অর্থনৈতিকভাবে কতটা স্বাবলম্বী হওয়া যাবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে ডাঃ শীল জানান যে, 'ছাগলের মাংসের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাগল পালন করলে অনেক টাকা আয় করা যেতে পারে। ছাগলের শরীরের সব কিছুই বিক্রি করা যায়। এননকী তার মল-মূত্রও সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাই ছাগল পালন সব দিক দিয়েই লাভজনক এবং বেকারত্ব দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার।'

আজকের ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন ড. রাসবিহারী ভড় মহোদয়। সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন শ্রীমতী সংঘমিত্রা মিশ্র মহোদয়া এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক মৃন্ময় বিশ্বাস।

রবিবারে বাঙ্গালির হেঁসেল খাসির মাংসের গন্ধে ভরে উঠুক। আর সেই ছাগল পালন করে বাঙ্গালি তথা ভারতবাসী অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ হোক। দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করার জন্য দধীচি ঋষির হাড় দিয়ে বজ্র তৈরি করেছিলেন। দধীচি নিজেকে নিঃশেষ করেও দেবতাদের রক্ষা করেছিলেন। আর কলিকালে ছাগলও একই কাজ করে চলেছে। তার শরীরের সব অংশ দিয়ে বেকার যুবকদের 'বেকারত্ব' নামক অসুরকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করছে। সত্যিকারের ছাগল হয়ে উঠুক কলিযুগের দধীচি— এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

—**মিলন খামারিয়া,**
রাণঘাট, নদীয়া।

With Best Compliments from :

A Well Wisher

ফুলের বিকাশ স্তব্ধ হলে জবাবদিহির দায় আমাদেরই

অনামিকা দে

ছোট্টো ঐশীকে স্কুল ইউনিফর্মে তৈরি করে হাত ধরে স্কুলবাসের ফুটস্টেপে তুলে দিচ্ছিল, তখনই একজোড়া হায়না দৃষ্টির চাউনিতে বুকটা ধড়াস করে উঠল ঐন্দ্রিলার। কিন্তু দিনের বেশ কিছুটা সময়ের জন্য তো ছেড়ে দিতেই হবে ওই অচেনা পৃথিবীতে ছোট্টো ঐশীকে। আচ্ছা, ঐশী যদি সায়ন বা ঋজু হতো তবেও কি ঐন্দ্রিলা এতটাই ভাবনায় পড়ত? হয়তো ভাবনাটা একটু কম হতো কিন্তু নির্মূল হতো কি? আসলে সভ্য সমাজের অসভ্য চিত্র অপ্রিয় হলেও সত্য এবং সেটিকে যত তাড়াতাড়ি মেনে নেওয়া যায় তত তাড়াতাড়িই তার থেকে মুক্তির পথ খোঁজা শুরু। কিন্তু সত্যি কি সমাজদর্শনের এই ঘৃণ্য চিত্রগুলি থেকে কোনোদিন আমরা মুক্তি পাব? বিকৃত মনুষ্যত্বের কিছু হিংস্র জানোয়ার যারা আপনার আমার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে— স্কুলে, রাস্তায়, বাসে, ট্রামে এমনকী বাড়ির নিরাপদ চার দেওয়ালের মধ্যেই যাদের বসবাস, তাদের আপনি কীভাবে চিনবেন বা আপনার ক্ষুদেটিকে চিনিয়ে দেবেন, অভিভাবকের কাছে এ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

ঐশীর বয়স এখন চার। মায়ের মন সারাদিন স্কুলে ঐশীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। কিছুদিন আগেই দক্ষিণ কলকাতায় একটি ইংলিশ মাধ্যমের স্কুলে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি এক কথায় বুঝিয়ে দিয়ে গেছে শিক্ষিত মানুষের বিকৃত রূপ কত ভয়ংকর হতে পারে। চার বছরের ছোট্ট ফুলকে নষ্ট করার খেলায় সেদিন মধ্যবেলায় মেতেছিল ওই স্কুলের দুই খেলার শিক্ষক।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে 'নাশন্যাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'-তে প্রকাশিত রিপোর্টিং অনুযায়ী ৩২,৬০৮ কেসের রিপোর্টিং হয়েছে ২০১৭-তে। যেখানে কী না ৩৯,৮২৭ কেস রিপোর্টিং হয়েছে ২০১৮-তে, দি প্রোটেকশান অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সচ্যুয়াল অফেন্সেস অ্যাক্ট-এর আওতায়। পশ্চিমবঙ্গে ২০১২-র একটি রিপোর্ট যদি স্টাডি করা যায়, দেখা যাবে ১০০টি কেস নথিভুক্ত আছে পিওএসসিও-এর আওতায়, সেটিও সাড়ে তিন মাসের মধ্যে। এর মধ্যে সর্বাধিক বাঁকুড়া জেলায় প্রায় ২৩টি কেস। নদীয়ায় ১৬টি ও মেদিনীপুরে ১০টি কেস সামনে আসে। মূলত ৫ থেকে ১৭ বছরের মেয়েরাই এর শিকার। ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর প্রোটেকশান অব চাইল্ড রাইটস্-এ জমা দেওয়া রাজ্য প্রশাসনের রিপোর্ট অনুযায়ী এরমধ্যে ৪৫টি ধর্ষণের কেস, ২২৩টি শ্লীলতাহানির কেস সামনে এসেছে। উল্লেখ্য, এই সব কেসের মধ্যে বাঁকুড়ার একটি ৪ বছরের শিশুকন্যার ধর্ষণ এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ৫ বছরের শিশুকন্যার ধর্ষণ। কয়েকটি কেসে এমনও সামনে এসেছে যে পরিবারের আত্মীয়দের দ্বারাই ছোট্ট মেয়েটি ধর্ষিত হয়েছে তার পরিবারের লোকের দ্বারাই।

'Centre for Operations Research and Traing'-এর ডাইরেক্টর শ্রীমতী সন্ধ্যা বার্জে (পিএইচডি) ভারতের শিশুদের ওপর একটি সমীক্ষা করে যে রিসোলিউশান দিয়েছেন তাতে পরিষ্কার ভাবে বেশ কিছু দিক উঠে এসেছে। চাইল্ড সেক্সচ্যুয়াল অ্যাবিউজ (সিএসএ)-কে চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। (১) ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, (২) সেক্সচ্যুয়াল অ্যাবিউজ, (৩) নেগলেক্ট এবং (৪) ইমোশান্যাল অ্যাবিউজ। সেই সমীক্ষা অনুযায়ী যে শিশু কন্যারা সবথেকে বেশি আক্রান্ত --- (১) পথশিশু, (২) ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত শিশুরা, (৩) যৌনকর্মীদের শিশুরা, (৪) অনাথ আশ্রমে বড়ো হওয়া শিশুকন্যারা, (৫) প্রতিবন্ধী শিশুরা। (৬) স্কুলে প্রথম ধাপের শিশুকন্যারা। এই সমীক্ষা থেকে এই তথ্যটিও পরিষ্কার যে ভারতবর্ষে নারী ও শিশুপাচারের একটি বড়ো চক্র কাজ করছে। ৪৪,৫০০ জন শিশুর মিসিং রিপোর্ট জমা হয়েছে। ২০০৫-এর রেকর্ড অনুযায়ী প্রায় পাঁচ লক্ষ শিশুকন্যাকে যৌনকর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হলো সেই সব তথ্য যা আজকের সভ্য, শিক্ষিত, আধুনিক সমাজের ভিত নাড়িয়ে দেয়। ছোট্ট ঐশিকে নিয়ে ঐন্দ্রিলার মনের যে আশঙ্কা তাকে আরও শক্ত করে। প্রত্যেক শিশুকন্যা হলো সুস্থ সমাজ গঠনের ভারসাম্যের প্রতীক, দশভুজা মায়ের অংশ।

তাই সভ্য সমাজের সভ্য নাগরিকের কাছে অনুরোধ, নিজেদের মনের দৃষ্টি খোলা রেখে চারিদিকে ঘটে চলা এই বর্বরতার প্রতিবাদ করুন, কারণ ফুলের বিকাশ স্তব্ধ হলে জবাবদিহির দায়ভার আমাদেরই। ◻

চোখের বিষয়ে সতর্ক থাকুন

রিংকী ব্যানার্জি

চোখ অত্যন্ত সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়। ফলে চোখে যে কোনও ধরনের সংক্রমণও হতে পারে খুব সহজেই। তাই চোখের যে কোনও ধরনের সংক্রমণের চটজলদি এবং সঠিক চিকিৎসা করা দরকার। অবহেলা করলে চিরকালের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাতে হতে পারে।

চোখের সাধারণ সমস্যা হয় চোখে কিছু পড়লে। চোখে কোনও ধরনের রাসায়নিক পদার্থ পড়লে, চোখে অতিরিক্ত তাপ লাগলে, কোনও ধরনের আঘাত লাগলেও চোখে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে।

রাসায়নিক পদার্থ চোখে পড়লে বা অতিরিক্ত তাপ লাগলে :

চোখে কোনও ধরনের অ্যাসিড বা কস্টিক সোডা জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ পড়তে পারে। আবার দেওয়ালিতে বাজি পোড়াতে গিয়ে চোখে আগুনের ফুলকি পড়তে বা অতিরিক্ত তাপ লাগাতে পারে।

এসব ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে যে সমস্যাগুলি দেখা দেয় সেগুলি হলো :

(১) প্রথমেই চোখে ব্যথা শুরু হবে। (২) আলোর দিকে তাকাতে সমস্যা হবে। (৩) চোখ থেকে ক্রমাগত জল পড়তে থাকবে। (৪) চোখের পাতা ফুলে যেতে পারে। (৫) চোখে আগুনের ফুলকি লাগলে বা অতিরিক্ত তাপ লাগলে চোখে পাতার নীচে প্রদাহও হতে পারে।

এই উপসর্গগুলি দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা করা উচিত। নইলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হতে পারে।

(১) হাত না ধুয়ে চোখে হাত দেওয়া উচিত নয়। চোখ কচলানো কোনও মতেই উচিত নয়। এতে চোখের সাময়িক আরাম হলেও দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হতে পারে। (২) চোখ না কচলে বরং হাতের আঙুল দিয়ে চোখের পাতা খুলে রাখুন। (৩) বারবার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন। অন্তত ২০ মিনিট জলের ঝাপটা দিলে উপকার পাওয়া যাবে। (৪) জীবাণুমুক্ত তুলো বা গজের কাপড় দিয়ে চোখ ঢেকে রাখুন। (৫) যদি চোখে আগুনের ফুলকি পড়ে বা অতিরিক্ত তাপ লাগে, তাহলে চোখে ভুলেও জলের ঝাপটা দেবে না। তার পরিবর্তে শুকনো তুলো বা গজ দিয়ে চোখ পরিষ্কার করে নিন। (৬) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চোখের চিকিৎসা শুরু করুন।

চোখে কিছু পড়লে :

(১) চোখ করকর করবে। (২) চোখে ব্যথা ও অস্বস্তি হবে। (৩) চোখ দিয়ে অনবরত জল থাকবে। (৪) চোখ লাল হয়ে যাবে। (৫) চোখ অর্ধেকটা বা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাবে। (৬) আলোর দিকে তাকানো যাবে না। (৭) চোখের পাতা কাঁপতে থাকবে।

চোখে কিছু পড়লে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দিতে হবে :

(১) চোখের সাদা অংশে বা চোখের পাতার কাছে না পড়লে বস্তুটি চোখ থেকে বের করার চেষ্টা করবেন না। সেক্ষেত্রে চোখের সমস্যা বাড়তে পারে। (২) চোখের মধ্যে কোনও কিছু ঢুকে গেলেও সেটাকে বের করার চেষ্টা করাই ভালো। (৩) চোখ কচলাবেন না। (৪) যা চোখে কিছু পড়েছে তা দেখা যাচ্ছে কি না। দেখা গেলে পরিষ্কার নরম কাপড়ের কোনা দিয়ে সাবধানে বের করে আনার চেষ্টা করুন। (৫) যদি দেখা না যায় তাহলে চোখে বারবার ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন।

চোখে কালশিটে পড়ে গেলে :

চোখে গুরুতর আঘাত লাগলে অনেক সময়েই চোখের চারপাশে রক্ত জমাট বেধে যায়। তখন চোখের চারপাশে রক্ত জমাট বাঁধার কালো দানা বা কালশিটে দেখা যায়। অনেক সময় চোখের ভিতরেও রক্তক্ষরণ হতে পারে।

সেক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য যা যা করতে হবে :

(১) প্রথমেই চোখ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা দেখে নিতে হবে। (২) কালসিটে পড়ে যাওয়া জায়গাটাতে বরফ লাগান। (৩) কোনও অবস্থাতেই চোখে সরাসরি বরফ লাগাবেন না। (৪) যদি চোখ ফুলে যায় বা চোখ খুলতে সমস্যা হয় তাহলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে কোনওরকম সিদ্ধান্ত নিলে তা ক্ষতি হবে নিজেরই। তাই অবশ্যই কোনও ভালো চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

(লেখিকা ন্যাচারোপ্যাথ, অপটিশিয়ান)

অয়ি গিরিনন্দিনী নন্দিতমোহিনী

অনামিকা দে

অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি বিশ্ব-বিনোদিনি নন্দনুতে।
গিরিবরবিন্ধ শিরোধিনিবাসিনি বিষ্ণু-বিলাসিনি জিষ্ণুনুতে।।
ভগবতি হে শিতিকণ্ঠ—কুটুম্বিনি ভূরিকুটুম্বিনি ভূরিকৃতে।
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিনি রম্যকপর্দিনি শৈলসুতে।।

অপেক্ষায় দিন গুনছি ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর ভোর ৪টে কখন আসবে। যখন রেডিয়োতে শঙ্খধ্বনির সঙ্গে শুরু হবে শিহরণ জাগানো মহালয়ার স্তোত্র। অপেক্ষা করে আছি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই দৃপ্ত কণ্ঠের স্পর্শ পাওয়ার আশায়। ভোরের অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিউলির গন্ধে মাতোয়ারা মন যখন সেই মাহেন্দ্রক্ষণের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে স্পর্শ করবে ঠিক তখনই রেডিয়োর ওপার থেকে গায়িকা সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে ভেসে আসবে— 'বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো রে ভুবন'।

শাস্ত্রমতে বলা হয় সপ্তমীতে মা দুর্গার আগমন। যদিও মায়ের আসার খবর প্রকৃতির আনাচে কানাচে বহুদিন আগে থেকেই সাড়া ফেলে দেয়। বৃষ্টির অবকাশে কালো মেঘ সরিয়ে যখন পেঁজা তুলোর রাশি দলবেঁধে আকাশে ভেসে বেড়ায় কিংবা দক্ষিণের হাওয়ায় মাঠভর্তি কাশফুল মাথা নেড়ে দোল খায় তখনই মন জানান দেয় মা আসছেন। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষও সেজে ওঠে মাকে বরণ করে নেবে বলে। পটুয়াপাড়ায় মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন প্রতিমা গড়ার কাজে। বাঁশ, খড়ের কাঠামোর ওপর মাটির প্রলেপ পড়ে, ধীরে ধীরে তৈরি হয় দশভুজার রূপ। শোলার কারখানায় শুরু হয় মায়ের শাড়ি আঁচল, গহনা তৈরির কাজ। মণ্ডপ সজ্জার শিল্পীরা তৎপর হয়ে ওঠেন এবারের পুজোয় বাঙ্গলায় কোন বিস্মৃতির আড়ালে যাওয়া শিল্পকে তুলে আনবেন শিল্প মর্যাদায়। অন্যদিকে পূজা কমিটিগুলির সদস্যরা বেরিয়ে পড়েন পাড়ায় চাঁদা সংগ্রহে। নতুন পোশাক কেনার হিড়িক পড়ে যায় বাঙ্গালির ঘরে ঘরে। সব শুধু 'মা আসছেন'— তাই সাজো সাজো রব।

অতিমারির মধ্যেই গত বছর উমা এসেছিলেন নিজের বাপের বাড়িতে। দশমীতে বিষণ্ণ সুরেই বিদায় জানিয়েছিলাম মাকে। এ বছর মায়ের আগমনে কি ফিরবে সুদিন? মৃৎশিল্পী, ডাকের শিল্পী বা মণ্ডপ সজ্জায় যুক্ত শিল্পীদের নিত্যদিনের হাল ফেরাবেন মা, এই আশাতে বুক বাঁধছে সবাই। এখন কী অবস্থায় আছেন তারা। কীভাবেই বা জীবনযুদ্ধের নৌকার হাল বাইছেন তারা— এই মনের খোঁজ নিতে ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়েছে স্বস্তিকার প্রতিনিধি। চলুন দেখে আসা যাক পুজোর জোগাড়ে শিল্পীদের বর্তমান রোজনামচা।

মৃৎশিল্পীদের প্রতি উদাসীন সরকার : পশুপতি রুদ্রপাল

৮/১, কুমারটুলি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৫। পুজোর আর বেশি দেরি নেই। তাই পটুয়াপাড়ার ব্যস্ততা তুঙ্গে। কুমারটুলির বিখ্যাত মৃৎশিল্পী পশুপতি রুদ্রপাল। তাঁর গড়া মায়ের মূর্তি স্থান করে নিয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তথা বিদেশের মাটিতেও। তবে ২০২০-র পর থেকে পশুপতিদা-সহ মৃৎশিল্পীরা ঠিক কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন বা করোনার অতিমারী তাদের জীবনকে কতটা প্রভাবিত করেছে অর্থাৎ এসময় তারা কেমন আছেন তা জানতেই স্বস্তিকার প্রতিনিধি অনামিকা দে গিয়েছিলেন ৮/১ কুমারটুলি স্ট্রিটে।

□ পশুপতিদা আপনার কর্মশালায় মূলত সাবেকি মূর্তিই দেখছি, আপনি কি থিম মূর্তিও তৈরি করেন।

● থিমের মূর্তি খুব কম গড়ি, সাবেকি আদলে মায়ের মূর্তি গড়তেই ভালো লাগে আমার ব্যক্তিগতভাবে।

□ প্রতিবারের মতো এবারেও কি প্রতিমার চাহিদা একই আছে, প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করেছেন কবে?

● না, একেবারেই নেই। এবারে তো পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা প্রতিমা অর্ডার করেছেন অনেক দেরিতে, আসলে লকডাউনের তো আগাম বার্তা থাকে না। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে করোনার তৃতীয় ঢেউ আসছে। সেই আশঙ্কায় অর্ডার এবার অনেক কম এবং এসেছেও দেরিতে। জুলাই মাসে কাজ শুরু করেছি। মহালয়ার পরপরই কাজে শেষ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়া, তৃতীয়ার দিন মণ্ডপে চলে যাবেন মা। তবে এবারের পরিস্থিতি গতবারের তুলনায় আরও খারাপ। অর্ডার অনেক কম। আগে ১০/১২ ফুট বা ১৮ ফুটেরও প্রতিমা গড়েছি। এখন ৫/৬ ফুটেরও প্রতিমার অর্ডার এসেছে। আমার এখান থেকে নাগপুরে প্রতিমা যায় প্রতি বছর। এছাড়া ফাইবার গ্লাসের মূর্তি পাড়ি দেয় প্রতিবছর বিদেশে। সেই অর্ডারও পুরোপুরি বন্ধ।

□ মৃৎশিল্পীদের এ সময়ে আর্থিক সংকটের মুখে পড়তে হচ্ছে ভীষণভাবে। কীভাবে মোকাবিলা করছেন?

● গতবছর যখন হঠাৎ লকডাউন হলো, যেহেতু তার আগের বছর অবধি খুব ভালো পরিস্থিতি ছিল তাই গত বছরটা খুব একটা চিন্তা করতে হয়নি। তখন তো এই পরিস্থিতি যে এইভাবে ধারাবাহিক রূপ নেবে বুঝতে পারিনি। পটুয়াপাড়ার মৃৎশিল্পীদের কাজটা হলো মরসুমি, তাই সারা বছরের অর্থজোগান ওই পূজা মরসুমেই হয়ে যায়। কিন্তু ২০২০-র লকডাউনের পর থেকে পুজোর সম্পূর্ণ জোগানই প্রায় বন্ধ ছিল। যদিও সেবছরটা পুজো না হলেও আর্থিকভাবে আমাদের এবারের মতো দুরবস্থা হয়নি। গত বছর যেহেতু আয় হয়নি তাই সারা বছর প্রায় ধার করেই চালাতে হয়েছে। তার মধ্যে কাঁচামাল কেনা, সহযোগী শিল্পীদের রোজ দেওয়া সবই করতে হচ্ছে। তাই আর্থিকভাবে সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমাদের। তবে এটা সত্যি যে শুধু মৃৎশিল্পী নয়, এই শারদীয়া পুজোর সঙ্গে যুক্ত ছোটো বড়ো ব্যবসায়ীদেরই বর্তমানে ধুঁকতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যে শিল্পীরা দূরদূরান্ত থেকে কলকাতার থিম পুজোর হস্তশিল্পে যুক্ত হন। প্রতিবছর ৫ থেকে ৬ মাস এই কর্মকাণ্ডে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করেন, তাদের কথা একবার ভেবে দেখুন। ছোটো কুটির শিল্প যেমন বাঁশের ঝুড়ি বা মাটির ভাড় বা শোলার কাজের যে অর্ডার এ সময় কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পায় তা সম্পূর্ণ ভাবেই ব্যাহত এই পরিস্থিতিতে।

□ রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার থেকে কি কোনো রকম সাহায্য পাচ্ছেন মৃৎশিল্পীরা?

● আমার জীবদ্দশায় রাজ্য বা কেন্দ্র কোনো তরফ থেকেই কোনো অনুদান বা সাহায্য মৃৎশিল্পীদের বরাতে জুটতে দেখিনি কখনো। তবে এই করোনা অতিমারীকালে যখন খোঁজ পাই যে অন্যান্য শিল্পীরাই কিছু না কিছু সাহায্য পাচ্ছে, তখনও মৃৎশিল্পীদের প্রতি সরকারি উদাসীনতা একটু ভাবায় বই কী।

‘অস্ত্রবিহীন মাকে দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলি’

শেফালি পাল কুমোরটুলির মৃৎশিল্পী। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় দেবী হয়ে ওঠেন অপরূপা। শেফালির গড়া মূর্তি চলে যায় বাঙ্গলার নানা প্রান্তে। এমনকী বিদেশেও। কিন্তু করোনা আবহে কেমন আছে কুমোরটুলি? কেমন আছেন শেফালিরা? অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় সেকথাই জানিয়েছেন শেফালি। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন অনামিকা দে।

□ শেফালিদি, আপনি কবে থেকে এই শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত?

● প্রায় ৩৬ বছর আগে শুরু করেছিলাম, আমার স্বামী নিলাম পাল, একসঙ্গে দুজনেই প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু করি। ধীরে ধীরে আজ প্রায় ৮/৯ জন কর্মী আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছে। মুখ্য শিল্পী পাঁচ-ছ'জন থাকে, তার সঙ্গে চার-পাঁচজন সহযোগী থাকে।

□ কর্মশালায় যুক্ত শিল্পীদের পারিশ্রমিক কী নিয়মে দিতে হয়?

● দুই হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা রোজ হিসেবে পায় শিল্পীরা। তার সঙ্গে প্রতিদিন দুবেলার খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হয়। নিজের হাতেই রান্না করে খাওয়া। এই মন্দার বাজারেও ওদের তো আর অসুবিধা করতে পারি না, ওরা সারাবছর আমাদের মুখ চেয়ে বসে থাকেন।

□ কিন্তু আপনারা সঠিক সময়ে সঠিক মূল্য পাচ্ছেন?

দিদিভাই, গত বছরের আগের সময়টা ছিল একদম অন্যরকম। পনেরো-ষোলো ফুটের ঠাকুর গড়তাম, সারা বছর মা অন্নপূর্ণা দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করতেন। সব মরসুমেই ঠাকুর গড়তাম তবে বছরের এই সময়টাই হতো বেশি উপার্জন। সবাইকে দিয়ে থুয়েও সারাবছরের জন্য সঞ্চয় করতাম। আর এখন, দশ-বারো ফুটের ঠাকুর গড়ছি তাও তো পূজা কমিটির বায়নাদাররা অগ্রিম বায়না দিতে চান না। ডেলিভারির সময় অর্ধেক টাকা ধরিয়ে দেন হাতে। শিল্পীদের সেভাবে সম্মান দেয় না ওরা। রাত্তিরে নেশা করে আসে মায়ের প্রতিমা বায়না করতে। এমন অনেক সময় হয় আমি একটু অন্যমনস্ক থাকলে টাকা না দিয়েই বলে দেয় দিয়েছি। যে কথায় বায়না হয়েছে, ডেলিভারির সময় অর্ধেক টাকা ধরিয়ে দেয় হাতে। শিল্পীদের মনের খবর রাখে না ওরা।

□ আপনি বলছিলেন এই দুই বছরে অনেক আর্থিক লোকসানের মুখে পড়েছে কুমারটুলি। আপনার অভিজ্ঞতা যদি বলেন।

● কী বলবো দিদিভাই, কুমারটুলির তো ভিত নড়ে গেল এই করোনা মহামারীর জন্য। দু-তিনজন তো ব্যবসা বন্ধ করে দোকানে তালা ঝুলিয়েছে। গত বছর অর্ডার দেওয়া পনেরে-ষোলো ফুটের প্রতিমা ডেলিভারি নেয়নি পূজা কমিটির উদ্যোক্তরা। প্রায় দেড় লক্ষ টাকার লোকসান হলো। তারপরই আমার স্বামী পুরোপুরি অসুস্থ হয়ে পড়ল, চিকিৎসার খরচ জোগাতে নাজেহাল হয়ে গেলাম। ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কোনোরকমে এবারে সব কাঁচামাল কিনলাম, প্রচুর খরচের জোগান দিয়ে তবে গিয়ে এক একটি প্রতিমার কাঠামো তৈরি হয়। এই লকডাউনে এক্কেবারে দেনায় ডুবে গেছি দিদিভাই। এখন মা-ই ভরসা।

□ আপনার গড়া প্রতিমা শুধু লোকাল জায়গায় নাকি বাইরেও পাঠান?

● কলকাতার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমার ঠাকুর যায়। বাইরে ফাইবার গ্লাসের তৈরি ঠাকুর আমি পাঠাই, কিন্তু এবার তো সবই বন্ধ। এবার শুধু কলকাতার কিছু মণ্ডপেরই অর্ডার এসেছে তাও সব ঠিকসময় সঠিক মূল্যে ডেলিভারি নেবে না।

□ আপনি মাতৃশক্তি, কথায় বলে, মা দুর্গা সকল নারীর মধ্যেই বিরাজ করেন। আপনিও তো একা হাতে এই সকল কর্মকাণ্ড সামলাচ্ছেন। আপনি সমাজকে কী বার্তা দিতে চাইবেন?

● মা দুর্গার পুজো করতে হয় শুদ্ধ মনে। মা আসেন আমাদের কাছে প্রতিবছর পাপমোচন করতে। বারোয়ারি পুজোর উদ্যোক্তরাই এখন দুর্গাপুজোটাকে ব্যবসায় পরিণত করেছে, আর এ যেন শুধুই আমোদ প্রমোদের কারণ। আসলে পুজোয় মনোভাব নেই এদের মনে। আর চারিদিকে শুধু থিম পুজোর গল্প। তাতে প্রতিমার যে কী রূপ দিচ্ছে এরা দেখলে চোখ বন্ধ করতে হয়। মায়ের দশ হাতের দশটি অস্ত্র বানিয়ে আসছি সেই কবে থেকে, প্রতিটি অস্ত্রের কত মহিমা তা কি জানে এই উদ্যোক্তরা? এখনকার থিম পুজোয় মা অস্ত্রবিহীন। ঘোর অনাচার, আর তারই ফল হলো এই করোনার অকাল ছায়া। মা সব দেখছেন। দশভুজা মা-ই সব রক্ষা করবেন। ■

মায়ের সাজ তৈরিতে ব্যস্ত বনকাপাসির শোলার সংসার

অগ্নিশিখা

মাঝে আর মাত্র কয়েকটা দিন। অতিমারীর ঝঞ্ঝায় যতই থাকুক কালো দিন, শরৎ বার্তা এনেছে, মা আসছেন। বাঙ্গালির প্রাণের পুজো দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন কার্যত শুরু হয়ে যায় রথের পরে পরেই। কিন্তু গত বছর ২০২০-তে এই সময়টা কেটেছে ম্লানমুখে, ধূসর ছিল আকাশ বাতাস। মা তো এসেছেন, কিন্তু ম্লান মুখেই দশমীতে বিদায় দিয়েছি তাঁকে। তারপর গোটা বছরটাই তো কাটলো অনিশ্চয়তায়। পুজোয় বায়না করেও ঠাকুর নিয়ে গেল না পূজা কমিটির ক্লাবগুলো। ফলে শিল্পীদের মাথায় হাত। সারা বছরের সংসার খরচের পয়সা জোটে এই সময়ে। ডাকের সাজের শিল্পী পথিক বা অভিষেক কীভাবে সামলাচ্ছেন আজকের এই অস্থির পরিস্থিতি। তাদের নিজেদের মুখ থেকেই জেনে নেবো আজ— তাদের মনের কথা।

পূর্ব বর্ধমানের বনকাপাসি গ্রাম, মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত এই ঠিকানাতেই রয়েছে প্রশান্ত ব্যানার্জির ডাকের শিল্পের কারখানা। বিগত ৩৪-৩৫ বছর ধরে এই ঠিকানাতেই তৈরি হয় সনাতনি ডাকের সাজ। শিল্পী অভিষেক, পথিক, রিপন, শুভংকর, পরিতোষ সবাই একটি পরিবারের মতো থেকে কাজ করেন এখানে।

প্রশান্ত কুমার ব্যানার্জি

আমি মঙ্গলকোট থানার বনকাপাসি গ্রামের বাসিন্দা। মাত্র ১৬ বছর বয়স থেকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছি। ছোট্টবেলায় মামার বাড়িতে গিয়ে দেখতাম শোলার কাজ হচ্ছে। তখন থেকেই মনে জেদ চেপেছিল যে শোলার কাজের নিজের একটি কারখানা তৈরি করব। সেই কুটিরশিল্পের উদ্যোগে ১ জন কারিগর নিয়ে তৈরি করেছিলাম কারখানা, আজ সেখানে আট-ন'জন কাজ করছে। আমার কারখানায় বিভিন্ন ধরনের শোলার সাজ, শোলার মূর্তি তৈরি হয়। আমার এখান থেকে উত্তরপ্রদেশেও শোলার মূর্তি গেছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সব জায়গাতেই দেবী মূর্তির সাজ পাঠাই আমরা। রাজ্য সরকার থেকে বনকাপাসি গ্রামে চার-পাঁচ বছর আগে একটি শোলার 'হাব' তৈরি হয়। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট পাই, এরপর ট্রেনিং মাস্টার হিসেবে আমায় নিযুক্ত করে, প্রায় দেড়মাস ধরে ওই ট্রেনিং চলে। এক একটি ব্যাচে ৬০ জন করে মহিলাকে ট্রেনিং দিয়েছি। এরপর সরকার থেকে একটি শংসাপত্র দেওয়া হয় আমাকে। তারপর থেকে মায়ের কৃপায় আমার কারখানায় কাজের বৃদ্ধি হয়। করোনা পরিস্থিতিতেও মায়ের কৃপায় কাজের ধারাবাহিকতা বজায় আছে।

অভিষেক ব্যানার্জি

নমস্কার, আমার নাম অভিষেক ব্যানার্জি। বর্ধমান জেলার বনকাপাসি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা। আমার হাতের যে কাজটি আপনারা দেখছেন সম্পূর্ণ শোলার কাজ। মায়ের আঁচল তৈরি হচ্ছে। প্রতিমার সাজের সব অলংকারও তৈরি করি আমরা। বিগত প্রায় দশ বছর ধরে আমি আমার কাকা প্রশান্ত ব্যানার্জির কাছে কাজ করছি। আমরা একটি পরিবার। এই পরিবারে প্রায় আট-ন'জন সহকর্মী আপন ভাইয়ের মতো মিলেমিশে কাজ করি। গত বছরের আগে অবধি পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। ডাকের সাজের চাহিদা সবসময়েই খুব ভালো। গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমাদের অর্ডার আসে। কিন্তু গত ২০২০-র পর থেকে আমাদের অর্ডারের সংখ্যা কমেছে। তাই টান পড়েছে সবেতেই। সারা বছরের অর্ডার মিলিয়ে শ্রমিকদের মাইনে দেওয়া মুশকিল হয়ে যাচ্ছে মালিকপক্ষের। তাও করোনার মোকাবিলা করে আমরা সবসময়েই চেষ্টা করে যাচ্ছি জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করার। মায়ের সাজের সরঞ্জাম বানানোর মধ্যে এক অদ্ভুত আনন্দ আছে। আসলে মা নিজের সাজ নিজেই বানিয়ে নেন। আমরা তো শুধু কাজ করি।

পথিক মাঝি

নমস্কার দিদি, আমার নাম পথিক মাঝি পূর্ব বর্ধমানে বাড়ি। পাঁচ বছর আগে এসেছিলাম এই কারখানায়। ধীরে ধীরে কাজ শিখেছি। শোলার কাজের খুবই চাহিদা আছে। কিন্তু বর্তমানে কিছুটা মন্দার বাজার। তাও আমাদের কারখানায় সকলেই খুব মিলেমিশে কাজ করি। এখন আমার হাতের যে কাজটি দেখছেন তা হলো মা দুর্গার গলার মালা। কাপড়ের ওপর শোলা দিয়ে হাতের কাজ, শেষ হতে সময় লাগবে। তবে দ্বিতীয়ার আগে সব সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

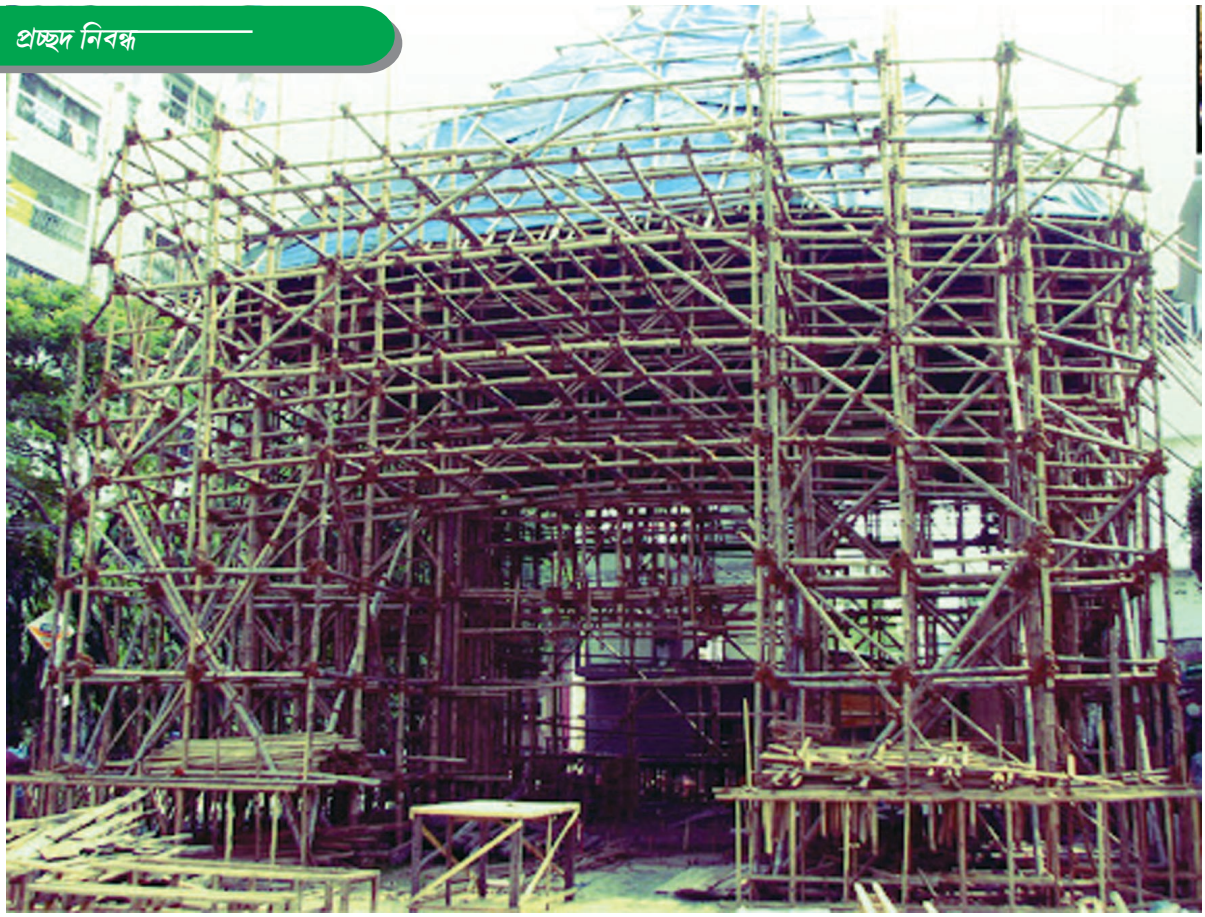

বাজেটে করোনার কোপ দিশেহারা মণ্ডপশিল্পীরা

স্বপন দাস

দুয়ারে দুর্গাপুজো। কেন এই কথা বলে লেখা শুরু করতে হলো, সেটা না বললে হয়তো একটু হলেও ধন্দে পড়তে হবে। গত বছর লেগে গিয়েছিল হোর্ডিং। নানা থিমের কথাও ভেসে বেড়াচ্ছিল আকাশে বাতাসে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। করোনা ভাইরাস লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে গোটা মানবজাতিকে। সেই ধ্বংসলীলা আজও চলছে। তবুও পুজো আসছে। আপামর বাঙ্গালির হৃদয়ে দুর্গাপুজো মানে একটুকরো অবকাশ আর আনন্দ। অন্তত কিছুটা হলেও সাময়িক ভাবে ভুলে থাকা বুকভরা হতাশা আর অনিশ্চয়তা।

বারোয়ারি পুজোর আয়োজনে মূল আকর্ষণ কলকাতা শহরের। কুমারটুলি বারোয়ারি থেকে সিমলা স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার থেকে মহম্মদ আলি পার্ক। আবার একডালিয়া এভারগ্রিন থেকে মুদিয়ালী, ওদিকে বড়িশা ক্লাব থেকে এসবি পার্ক। আশির দশক থেকেই পুজোর আঙ্গিকে আসে নানা পরিবর্তন। সাবেকি ঘরানার আভিজাত্য থেকে বেরিয়ে আসে মূর্তির ও মণ্ডপের আঙ্গিক। জন্ম নেয় থিম। একদিকে উত্তর কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, তাঁদের মণ্ডপে আনে নানা অনুকরণ। অন্যদিকে ছকভাঙার খেলায় মাতে কসবা বোস পুকুরের মতো ক্লাবগুলি। এই আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভাঁড়ের প্যান্ডেল করে আঙ্গিকের ব্যাকরণ ভাঙে আয়োজকরা। একসময়ে মাটি ছাড়াও নানা মাধ্যমের ব্যবহারে মূর্তির ক্ষেত্রে খড় ও মাটির যে চিরাচরিত সাবেকি ধারা, সেটা থেকে একটু সরে এসেছিল। বিস্কুট থেকে বরফের ঠাকুর সেই সময়ে দেখা গিয়েছিল মণ্ডপে, এমনকী রান্নার মশলাও

করোনা এখনও আমাদের ছেড়ে যায়নি। লাগাম ছাড়া আনন্দের মাঝে যেন মৃত্যুকে আহ্বান করে না আনি। মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমার, আপনার সবার হাতে। সেটা মনে রাখতে হবে বারে বারে।

বাদ যায়নি সে সময়। এই সময় থেকেই মূর্তির সাবেকি ধারায় একটু হলেও পরিবর্তন আসে। এই আশির দশকের শেষ দিক থেকেই গোটা রাজ্য জুড়েই থিম পুজোর শুরু। আর রমরমা শুরু হয় নব্বই দশকের একেবারে প্রথম থেকেই। সাবেকি সেই মণ্ডপসজ্জা হারিয়ে যায় অনেকখানিই। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি কর্পোরেটদের চোখ পড়ে বাঙ্গালির এই বৃহত্তম উৎসবে। সঙ্গে সঙ্গে আয়োজনের ক্ষেত্রে বাজেট বাড়তে শুরু করে হু হু করে। এর সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করে নানা প্রতিযোগিতা। ফলে বড়ো বড়ো পুজো কমিটিগুলি নিজেদের মধ্যে পুরস্কারের লড়াইতে জিততে মরিয়া হয়ে ওঠে। শহর আর শহর ছাড়িয়ে জেলার পুজোতেও একটা কর্পোরেট চেহারা পেয়ে যায়। বাজেটও বেড়ে যায় লাগাম ছাড়া।

গত বছর করোনা অতিমারীর কারণে দুর্গা পুজোর আয়োজনে বড়ো ধাক্কা খেতে হয় পুজোগুলিকে। করোনা স্বাস্থ্য বিধিতে ছাঁটকাট করতে হয় পুজোর আয়োজনে। নানা বাধা-নিষেধ মানতে হয় করোনাকে মনে রেখে। নমঃ নমঃ করে সারতে হয় পুজো। এমনিতেই একটি পুজোর আয়োজন শুরুই হয়ে যায় প্রায় ছয় থেকে সাত মাস আগে। সেখানে করোনার বাড়বাড়ন্তে একেবারে পিক পয়েন্টে বাতিল হয়ে যায় সব। মানুষ আতঙ্কে ঘরের বাইরে একেবারে বেরতে চাননি। এভাবেই কাটছে প্রায় দু বছরের কিছুটা কম সময়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ঢেউ ছারখার করে দিয়েছে অনেক কিছুই। এখন আবার দুয়ারে তৃতীয় ঢেউ। সেখানেও রয়েছে সাবধান বাণী। সঙ্গে রয়েছে স্বাস্থ্য বিধি মেনে আয়োজনের নির্দেশিকা।

বাঙ্গালির এই উৎসব যাদের হাত ধরে সেজে ওঠে তাঁদের অনেকের কাছেই এই পুজো এবছর কেমন? সেটা জিজ্ঞেস করাতে, খুব একটা ভালো উত্তর পাওয়া গেল না। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিমা ও মণ্ডপ ভাবনা থেকে বাস্তবায়ন করছেন শিল্পী পুর্ণেন্দু দে। তাঁর মতে করোনা সবদিক দিয়েই ধাক্কা দিয়েছে সমস্ত ভাবনায়। চিরাচরিত ধারা থেকে বেরিয়ে এসে একেবরে অন্য রকমের চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে। সরকার নির্দেশিত পথে চলতে গিয়ে মণ্ডপের আঙ্গিকে আনতে হয়েছে অনেক পরিবর্তন। এখন মণ্ডপে যারা আসবেন, তাঁদের মণ্ডপে ঢুকতে দেওয়া হবে না। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে দর্শনার্থীরা প্রতিমা দর্শন করবেন। ফলে বহিরঙ্গের ভাবনাটাকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে বেশি। আগে এই বিষয়টা ছিল মণ্ডপের একেবারে ভিতরের। সেখানে নানা শৈল্পিক সৌন্দর্যে সাজিয়ে তুলতেন শিল্পীরা। তাঁদের ক্যানভাস হয়ে উঠত এই ভিতরের অংশটা। সেটা থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তা করতে হচ্ছে। ফলে যা হবার তাই। অন্যদিকে হাতে সময় পাওয়া যাচ্ছে খুব কম। এক মাসের কিছু বেশি। উদ্যোক্তাদের বাজেট খুব কমে যাওয়ায় একটু বেশি ধরনের অসুবিধা হচ্ছে। তবুও চেষ্টা করতে হচ্ছে কম বাজেটে কিছু একটা করার। সেই মতো চিন্তা বা ভাবনার বিষয়টাকেও বাস্তবায়নের দিকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। যারা এই মণ্ডপ থেকে প্রতিমার কাজ করবেন, সেই কর্মী পেতে যেমন অসুবিধা হচ্ছে, পাওয়া গেলেও তারা আকাশছোঁয়া একটা পারিশ্রমিক দাবি করছেন। যেটা হয়তো অনেক সময় প্রায় বাধ্য হয়েই দিতে হচ্ছে। এর কারণ হিসেবে তিনি নিজেদের অস্তিত্বকে অনেকটা টিকিয়ে রাখার জন্য কাজটা করতে হচ্ছে বলে মনে করেন।

আরেক শিল্পী, ভবতোষ সুতার মনে করেন এই অতিমারীতে তিনি অনেক কিছুকেই খুব সামনে থেকে দেখলেন। অনেক পরিস্থিতির সামনা সামনি হলেন। আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই যে চিন্তা ভাবনার জন্ম, সেটাকেই তিনি বাস্তবায়নের সুযোগ পাচ্ছেন এবারের পুজোর আয়োজনে। ফলে একটা সচেতনতার বার্তা থাকবে তার চিন্তায়। তিনি মনে করেন, এই আয়োজনের সুযোগে বেশ কিছু মানুষের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সেটাকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। আর এই অতিমারিতে ভাবনা চিন্তা এমনভাবে করেছেন যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মণ্ডপ তৈরিতে অংশ নিতে পারছেন বিভিন্ন পেশার শিল্পীরা। তারাও একটা আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন। তার মতে এই অতিমারিতে মা দুর্গা আসছেন একেবারে আশীর্বাদ নিয়েই। হয়তো সময় ও বাজেট কম। তবুও সেভাবেই ভাবতে হচ্ছে সব কিছুকে। যেটা তাঁদের সৃষ্টির মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে। অন্যদিকে ভবতোষের সর্বক্ষণের সঙ্গী শিল্পী স্ত্রী মল্লিকার কাছে আবার সময় ও বাজেট একটি প্রধান বিষয়। এই বাজেট ও সময়কে মেনে নিয়েই করতে হচ্ছে সব, বলে তিনি জনান।

ছোটো মণ্ডপ তৈরিতে পরিচিত নাম অসীম কুণ্ডু। কম বাজেটে মণ্ডপ তৈরি। আর সেই মণ্ডপে দর্শকের মন জয় করে নেওয়াতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এবারের পুজোতে তিনি প্রায় কর্মহীন। কারণ বাজেট আর বেড়ে যাওয়া খরচ, প্যান্ডেলের খাঁচা তৈরি থেকে সহযোগী শ্রমিকের পারিশ্রমিক, এবার আকাশছোঁয়া। ফলে যে বাজেট পুজোর আয়োজকরা তাঁদের জন্য বরাদ্দ করেছেন, সেটা দিয়ে খুব জোর একটা সাধারণ কাপড়ের মণ্ডপ তৈরি হবে, তার বেশি নয়। তবুও অসীমবাবুরা সারা বছর তাকিয়ে থাকেন তাঁদের শিল্পকর্মও ভাবনার বাস্তবায়নের প্রদর্শনীর একটা মাধ্যম হিসেবে এই পুজোকে। সেই জন্যই করতে হচ্ছে সব কিছুকে মেনে নিয়ে। তিনি মনে করেন যে করোনা অতিমারিতে প্রাধান্য দেওয়া উচিত প্রতিরোধের বিষয়টিকে। আগে মানুষকে বাঁচাতে হবে। তারপর সব কিছুকে রখতে হবে। ফলে পুজোর আয়োজন সেভাবেই করোনা স্বাস্থ্য বিধি মেনে, নির্দেশিত পথেই করা উচিত। আর দর্শনার্থীদের এভাবেই এই পুজোতে অংশ নেওয়া উচিত যাতে করোনার হাত থেকে তিনি ও তার সঙ্গে সবাইকে নিরাপত্তা দিতে সাহায্য করতে পারেন।

এবারের দুর্গাপুজোর আয়োজনে অনেকটা জায়গা জুড়েই প্রভাবিত হচ্ছে রাজ্যের শাসক দলের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে। আবার কোনো পুজোর উদ্যোক্তা তো রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমোকে আর কাজকর্মকে নির্লজ্জ ভাবে এই দুর্গা পুজোতে নিয়ে আসছেন। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। কেননা দেবী দুর্গার মূর্তি হচ্ছে তৃণমূল সুপ্রিমোর আদলে। তার দশ হাত অস্ত্রের বদলে সজ্জিত হবে তার সরকারের নানা প্রকল্পে। এভাবে নির্লজ্জ ভজনা মনে হয় দুর্গা পুজোর ইতিহাসে এই প্রথম। এমনটাই মত তাঁদের। তাঁরা আরও বলেছেন যে এই মমতারূপী মূর্তির পায়ে পুণ্যার্থীরা অঞ্জলি দেবেন মন্ত্রসহযোগে। একটি ধর্মীয় আয়োজনে এই সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আঘাত করার অধিকার কী করে উদ্যোক্তারা পেলেন, সেটও চিন্তনীয় বিষয়। একই কথা বলেছেন সাধারণ মানুষ থেকে পুজোর আয়োজনে যুক্ত থাকা শিল্পী থেকে পুরোহিতরাও। এই বিষয়টাকে মন থেকে মেনে নিতে পারছেন না কেউই। প্রসঙ্গত, শিল্পী ফিদা হুসেন দেবীমূর্তি এঁকেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর আদলে। সেটা কিন্তু মেনে নিতে পারেননি অনেকেই। এবার রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমোর দেবী দুর্গার রূপে পূজিত হওয়া, আর এটাকে কীভাবে বাঙ্গালি মেনে নেন সেটাই দেখার।

তবে শেষে একটা কথা বলতেই হয়। পুজো আসছে। আনন্দ করতে সবাই রাজি। মনে রাখতে হবে, করোনা এখনও আমাদের ছেড়ে যায়নি। তার নখ ও দাঁতের কামড়ের ভয়ংকর রূপ দ্বিতীয় ঢেউতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তৃতীয় ঢেউ কীরূপে আসতে চলেছে, সেটা নিয়ে সতর্ক করেছেন চিকিৎসক থেকে বিশেষজ্ঞরা। ফলে সেদিকে আমাদের সবাইকে লক্ষ্য রেখেই আনন্দে মাততে হবে। লাগাম ছাড়া আনন্দের মাঝে যেন মৃত্যুকে আহ্বান না করে আনি। মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু আমার, আপনার সবার হাতে। সেটা মনে রাখতে হবে বারে বারে।

নিরস্ত্র দুর্গা, উজ্জীবিত মহিষাসুর

চন্দ্রভানু ঘোষাল

প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে বাঙ্গলা ছিল প্রধান শক্তিক্ষেত্র। ব্রিটিশ আমলেও, দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবীরা মহাকালীকে তাঁদের ধ্যানবিন্দুতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট ভোগদখলে চলে যাবার পর আমরা এক অন্যরকম বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালিকে দেখলাম। এই সময় দুর্গাপুজো দুর্গোৎসবে পরিণত হলো। এবং চিলেকোঠায় ঝুলঝাড়ু নিয়ে গোলা পায়রা তাড়ানো বাঙ্গালি থিমের মণ্ডপে অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে গিয়ে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করল মায়ের দশটি হাত তো আছে কিন্তু হাতে কোনও অস্ত্র নেই। কেউ হাতে পদ্মফুল ঝুলিয়ে দিয়েছেন, কেউ আবার তাও দেননি। অস্ত্রহীন মা মর্মান্তিক বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছেন মণ্ডপের উপচে পড়া ভিড়ের দিকে।

বলাবাহুল্য, এমন একটি নিঃশব্দ বিপ্লবে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন বাঙ্গালি মহিষাসুরেরা। তারা আগে ছিলেন বাম। এখন বামের বিধি বাম হওয়াতে তারা সবাই তৃণমূল। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, যেসব বাঙ্গালি এখনও মহিষাসুর হয়ে যাননি তারা এইসব থিমের পুজো, অস্ত্রহীন দুর্গা এবং দুর্গোৎসবকে কীভাবে দেখছেন? এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে কথা হচ্ছিল যাদবপুরের শ্রীপর্ণা রায়ের সঙ্গে। শ্রীপর্ণা পেশায় অধ্যাপক। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, 'দেখুন, অস্ত্র না থাকলে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন— এই কনসেপ্টটাই তো মিথ্যে হয়ে যায়। আর পুজোকে পুজো বলুন বা উৎসব— মূল ঘটনাটা তাতে পাল্টায় কি? পুজো পুজোই থেকে যায়।' প্রায় একই রকম কথা শোনা গেল শেফালি পালের মুখেও। শেফালি মৃৎশিল্পী। কুমোরটুলিতে ওর স্টুডিয়ো আছে। তিনি বলেন, 'অস্ত্রহীন মাকে দেখে চোখ বন্ধ করে ফেলি।'

না, শুধু এরাই নন। শহুরে বামপন্থী বামনদের পিছনে ফেলে যতই প্রান্তবাসী বাঙ্গলার দিকে এগোই ততই যেন সত্যজিতের ক্যামেরায় বন্দি অপু-দুর্গার ভালোবাসার গ্রামবাঙ্গলা একটু একটু করে ফুটে ওঠে। সেখানে দুর্গা এখনও উমা। বাঙ্গলার ঘরের মেয়ে। এক বছর পর পিত্রালয়ে এসেছে মেয়ে। তাই আনন্দের সীমা নেই। মা-ঠাকুমারা মেয়েকে বরণ করে ঘরে তোলার আয়োজনে ব্যস্ত। কাকা-জ্যেঠারা ব্যস্ত পাঁচদিনের বাজারহাটের ফর্দ তৈরিতে। আর ছোটোরা ব্যস্ত পাঁচদিনে সে যে কী দারুণ আনন্দ হবে তার আগাম পরিকল্পনায়। এই ভাবসম্মিলনের জোয়ারে যোগ দিয়েছে প্রকৃতিও। তার ভাণ্ডারে যত রং ছিল সব সে ঢেলে দিয়েছে আকাশে। নদীর ধারে কাশফুল ফুটিয়েছে সে অকৃপণ হাতে। গৃহস্থের উঠোনে ফুটিয়েছে শিউলি। মাঝে মাঝে বৃষ্টি এসে বলে যাচ্ছে মা আসছেন। দূরে মণ্ডপের জন্য আনা বাঁশ পড়ার শব্দ এসে বলে যাচ্ছে, মা আসছেন।

হ্যাঁ, মা আসছেন। এবং অস্ত্র হাতেই আসছেন। কারণ গ্রামের বাঙ্গালি গৃহবধূ জানেন, শুধু সোনার গয়নায় উমাকে সাজানো যায় না। দশ হাতে দশ অস্ত্রও তার অলংকার। হাতে ত্রিশূল না থাকলে উমা দুর্গা হবেন কী করে! শুধু শাঁখাপলায় কি অসুরদলনী হওয়া যায়?

অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়েই হবে মানবজাতির উত্থান ঃ ড. বিজয় ভাটকর

'ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে প্রত্যেক দেশবাসী সংকল্পবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র নির্মাণে নিজেকে সমর্পিত করলে আমরা বিশ্বকে এক নতুন দিশা দেখাতে সমর্থ হবো। ভারত বিশ্বগুরু ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের সংস্কৃতি আমাদের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ— এটিই বিশ্বকল্যাণের হেতু। অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়েই হবে সমগ্র মানবজাতির উত্থান'— কলকাতার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক-সামাজিক সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয় দ্বারা আয়োজিত ৩১তম ডাঃ হেডগেওয়ার প্রজ্ঞা সম্মান অনুষ্ঠানে কথাগুলি বলেন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, সুপার কমপিউটারের জনক ড. বিজয় পাণ্ডুরঙ্গ ভাটকর। মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পুনের 'দ্য ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ। শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে সম্মানস্বরূপ শ্রীভাটকরকে শাল, মানপত্র ও একলক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ইত্যাদি বহু সম্মানে ভূষিত ড. ভাটকর বলেন, এই সম্মান আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই সম্মান মাটির সঙ্গে সংপৃক্ত। তিনি বলেন, আমাদের সংস্কৃত ভাষার অপার ক্ষমতা রয়েছে, এটি কমপিউটারের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী ভাষা। হিন্দি ও সমস্ত ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞানের পঠনপাঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই দৃষ্টিতে তিনি নয়া শিক্ষানীতির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানও একটি দর্শন। অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান একসঙ্গে চললেই বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর ভাবনা সাকার হবে।

অনুষ্ঠানের মুখ্য বক্তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর কলকাতা থেকে অনুষ্ঠানে অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ড. ভাটকর সুপার কমপিউটার নির্মাণ করে বিশ্বের দরবারে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। তাঁর সাধনা ঋষিতুল্য। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের মনুষ্যনির্মাণ সূত্রের উল্লেখ করে সহ-সরকার্যবাহ বলেন ডাক্তারজী মানুষের আত্মকেন্দ্রিক ভাবনাকে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক করে হিন্দু সমাজকে সুসংগঠিত করার কাজ করেন। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব বর্ষে প্রত্যেক দেশবাসীর মনে আত্মবোধ(স্ব)-এর জাগরণ ঘটানোর আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহারাষ্ট্র এডুকেশন সোসাইটি, পুনের পূর্বতন অধ্যক্ষ তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মহানগর সঙ্ঘচালক রবীন্দ্র যশবন্ত বঞ্জারওয়াড়কর। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন সমরসতা গুরুকুলমের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী পদ্মশ্রী গিরীশ প্রভুণে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ড. তারা দুগড় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন পুস্তকালয়ের সাধারণ সম্পাদক মহাবীর বাজাজ। অনুষ্ঠানে অনলাইনে কয়েক হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

মালদহের চাঁচলে পরিবার প্রবোধনের মাতৃসম্মেলন

গত ৪ সেপ্টেম্বর উত্তর মালদহ জেলার চাঁচল নগরে পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে এক মাতৃ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন হরিশ্চন্দ্রপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা সরকার।

বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পরিবার প্রবোধনের উপদেষ্টা মটুকেশ্বর পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের জেলা সহ-কার্যবাহ অজিত প্রামাণিক। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী চন্দনা চ্যাটার্জি।

বৃহদেশ্বর দেবাদিবের অনুপম দেউল

কৌশিক রায়

ভারতের শিবমন্দির বলতে ওড়িশার লিঙ্গরাজ, ত্রম্ব্যকেশ্বর এবং কেদারনাথের মন্দিরের নামগুলোই সবচেয়ে প্রথমে আমাদের মাথায় চলে আসে। তবে, তামিল নাড়ুর থাঞ্জাভুর (পূর্বতন তাঞ্জোর) জেলার অন্তর্গত কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বৃহদেশ্বর মন্দিরটি যে শৈবভক্তি এবং শৈব স্থাপত্যের অন্যতম ঈর্ষণীয় উদাহরণ হয়ে ইউনেস্কোর সুবিচারে বিশ্বের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য নিদর্শনে পরিণত হয়েছে— সেটা অবশ্যই আমাদের সশ্রদ্ধচিত্তে স্বীকার করতে হবে। বিশ্বের মধ্যে একমাত্র এই বৃহদেশ্বর (রাজরাজেশ্বরম বা পেরুভুদাইয়ার কোভি) মন্দিরটিই সম্পূর্ণভাবে গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি।

দাক্ষিণাত্যে চের এবং পাণ্ড্য ও পুলকেশী রাজবংশগুলির সঙ্গে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক সমন্বয়সাধনে, নাগরিক সুরক্ষাতে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল চোল রাজবংশ। ভারতের প্রথম নৌশক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে কেরলের কোচি এবং তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন বন্দরদুটিকে যথেষ্ট সুরক্ষিত করে তুলেছিলেন চোল বংশের নৃপতিরা। এই বংশের রাজা— প্রথম রাজ রাজা তাঁর আরাধ্য দেবতা— মহেশ্বর শিবের উদ্দেশে তাঁর সশ্রদ্ধ নিবেদন হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন এই বৃহদেশ্বর মন্দিরটিকে। আনুমানিক ১০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ২১৭ ফিট উচ্চতায় এবং স্বীয় স্থাপত্যে মহিমাময় এই বৃহদেশ্বর মন্দিরটির নির্মাণকার্য শেষ হয়। সম্ভবত চালুক্যরাজ প্রথম ও দ্বিতীয় পুলকেশীর দ্বারা আইহোল, বাদামি এবং পাত্তাদাকাল-এর নির্মিক মন্দির সমূহ এবং মামল্লপুরমে (মহাবলীপুরম) পল্লবরাজ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের তৈরি উপাসনালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই এই বৃহদেশ্বর শিব দেউল গড়ে তোলাতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন প্রথম রাজ রাজ চোর। স্থাপত্য-বিষয়ক ইংরেজ ইতিহাসবিদ জর্জ মিচেলের মতে এই বৃহদেশ্বর মন্দিরের প্রধান তোরণদ্বারসমূহ (গোপুরম), স্তম্ভ, চূড়াশীর্ষ এবং খিলান (আর্চ) নির্মাণে গ্রিক 'দোরীয়', 'আইও নীর' এবং 'কোরিন্থীয়' স্থাপত্যরীতিকে অনেকটাই অনুসরণ করেছিলেন দূরদর্শী প্রথম রাজ রাজ চোল। সেক্ষেত্রে ইন্দো-গ্রিক গান্ধার মিশ্র স্থাপত্য সংস্কৃতির যোগ্য ঐতিহ্যবাহী হিসেবে বৃহদেশ্বর মন্দিরকে চিহ্নিত করা যেতেই পারে।

তবে, মাদুরাইতে সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির বশংবদ সেনাপ্রধান মালিক কাফুর এবং গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সেনাবাহিনীর আক্রমণের ফলে বৃহদেশ্বরের মন্দির ভাস্কর্যের বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছিল। তবে, সপ্তদশ শতকে এই মন্দিরের কিছুটা সংস্কার করে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় (মরুগান), দেবী পার্বতী (আম্মান), শিবানুচর নন্দী এবং দক্ষিণামূর্তির বিগ্রহ এবং মন্দিরগৃহ বৃহদেশ্বর মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করা হয়। তামিল ভাষাতে উঁচু ভিতের ওপর জ্যামিতিক নক্শাকে মান্য করে স্থাপিত এই ধরনের মন্দিরের স্থাপত্যকে বলা হয়ে থাকে 'পেরুনকোল্লি' বা 'মদাক্কোলি'। বৃহদেশ্বরের আয়তাকার মন্দির চত্বরটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে ২৪১ মিটার এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রায় ১২২

মিটার পর্যন্ত বিস্মৃত। মন্দিরটির চারটি প্রধান অংশ 'শ্রী বিমান', 'নন্দী মণ্ডপম', 'মুক্তমণ্ডপম' এবং বৃহৎ সম্মেলন কক্ষ বা 'মহামণ্ডপম'। মন্দিরটির বারান্দার পরিধি প্রায় ১৪৮০ ফিট-এর মতো। ১৭৭৭ সালে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসি শক্তির যুদ্ধের সময় ফরাসি গভর্নর— জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দ্যুপ্লে ও ফরাসি সেনাপতি ব্যুসির নির্দেশে এই বৃহদেশ্বর মন্দিরের কয়েকটি কক্ষে ফরাসি অস্ত্রাগার এবং কোষাগার তৈরি করা হয়েছিল। বৃহদেশ্বর মন্দিরের একটি ৩৩০ ফিট উঁচু তোরণদ্বার তৈরি করিয়েছিলেন প্রথম রাজ রাজ চোল। গোপুরমটির নাম দেওয়া হয় 'রাজরাজন তিরুভাসাল।' গোপুরমগুলির ওপর তামিল ও সংস্কৃত ভাষাতে বৈদিক শাস্ত্রের

বিভিন্ন স্তোত্র খোদাই করা আছে। এছাড়াও, দেবাদিদেব মহাদেবের জটাদেশে গঙ্গোদক ধারণের মতো বেশ কিছু পৌরাণিক কাহিনির চিত্রও খোদাই করা আছে বৃহদেশ্বর মন্দিরের গোপুরমগুলির ওপর। মন্দিরটির মধ্যে প্রথম রাজ রাজ চোলের কুলগুরু- কারুভুরদেবেরও একটি সুরম্য, নাতিদীর্ঘ উপাসনালয় বর্তমান। তবে, বৃহদেশ্বর মন্দিরের কেন্দ্রীয় উপাসনাগৃহ বা গর্ভগৃহটি (কারুভারাই), বৃহদাকারারের প্রস্তর শিবলিঙ্গ নিয়ে সত্যিই অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছে। প্রধান উপাসনালয়টির চারদিকে আছে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের চলাচলের জন্য প্রশস্ত পরিক্রমা পথ। ছান্দসিক স্থাপত্যশৈলীর স্তরে স্তরে নির্মিত হয়েছে 'শ্রী বিমান' গর্ভগৃহের মূল চূড়াটি। গর্ভগৃহের শিব লিঙ্গটির উচ্চতা প্রায় ২৯ ফিটের মতো।

বৃহদেশ্বর মন্দিরটির চারদিকে আছে দ্বারপাল বা প্রহরীর মূর্তি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভিয়েতনামে (পূর্বতন চম্পা রাষ্ট্র) ভারতীয় রাজাদের উদ্যোগে যে মন্দিরগুলো গড়ে তোলা হয়, তার প্রবেশদ্বারগুলোতেও এইরকম দ্বারপালদের মূর্তি ছিল। বৃহদেশ্বরের মন্দির দেওয়ালগুলির পাথর খোদাই ভাস্কর্যগুলিও অসাধারণ। এগুলির মধ্যে আছে লিঙ্গোদ্ভব বা দণ্ডায়মান শিবমূর্তি, পাশুপত অস্ত্রধারী শিব, তাণ্ডব নৃত্যরত নটরাজ, অর্ধশিব ও অর্ধ বিষ্ণু মূলক হরিহর, অর্ধশিব, অর্ধ পার্বতী মূর্তি বা অর্ধনারীশ্বর এবং চন্দ্রশেখর শিবমূর্তি। বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে শিবের 'ত্রিপুরন্তক' মূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য। তবে, বৃহদেশ্বর শিব মন্দিরের অন্যতম বিস্ময় হলো প্রায় ৮০ টন ওজনবিশিষ্ট, বর্গাকার একটি সুবিশাল গ্র্যানাইট পাথর। ইংল্যান্ডের সল্‌স্‌বেরি প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন স্টোনহেন্‌জ প্রস্তরসজ্জার সঙ্গে এই পাথরটির তুলনা করা চলে।

এছাড়াও বৃহদেশ্বর মন্দিরের দেওয়ালের প্যানেলে আছে ভারতের অন্যতম ধ্রুপদী নৃত্য ভরতনাট্যমের বেশ কয়েকটি মুদ্রাভঙ্গিমার চিত্র। এছাড়াও, অজন্তা-ইলোরার গুহাগুলির মতনই, বৃহদেশ্বর মন্দিরের ভিতরদিকের দেওয়ালগুলোতে কলিচুন বা লাইমস্টোনের সঙ্গে প্রাকৃতিক রং মিশিয়ে বিভিন্ন ফ্রেস্কো তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ৭২০০ বর্গ ফিট দৈর্ঘ্যযুক্ত এই ফ্রেস্কোগুলোকে ১৯৩১ সালে আবিষ্কার করেন তামিলনাড়ুর আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস.কে গোবিন্দস্বামী। ফ্রেস্কোগুলিতে দেবাদিদেব মহাদেব ছাড়াও দুর্গা, পার্বতী, অগ্নি, দেবরাজ ইন্দ্র, কুবের ও বরুণদেবেরও বিভিন্ন কীর্তিকাহিনির চিত্র খোদাই করা আছে। সম্ভবত, বৃহদেশ্বরের মন্দিরের অঙ্গ হিসেবে সপ্তমাতৃকা, ভৈরব, গণেশ এবং চণ্ডেশ্বরের মন্দিরগৃহও তৈরি করা হয়েছিল।

তবে, বহিঃশত্রুদের আক্রমণে বর্তমানে বারাহীমাতার (সপ্তমাতৃকার অন্যতমা) মন্দির ছাড়া অন্য মন্দিরগুলির মূলগঠন অক্ষত অবস্থায় নেই। মন্দিরের বিভিন্ন গৃহে শত শত বছর ধরে দেবোপাসনার জন্য জ্বালানো প্রদীপের ধোঁয়া এবং শিখার জন্য মন্দিরটির অনেক ফ্রেস্কো এবং দেওয়াল লিপি ও প্রস্তর চিত্র (ম্যুরাল) অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ রাজ চোলের মূর্তিটি এবং তাঁর রাজত্বকাল সম্পর্কে মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ৬৪টি তামিল ও সংস্কৃত লিপিচিত্রও অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে। লিপিগুলির মধ্যে দুই পাণ্ড্যবংশীয় মিত্ররাজা প্রথম কোলুত্তুঙ্গা এবং রাজেন্দ্রদেব এবং বিজয়নগরের দুই রাজা— অচ্যুতাপ্পা নায়ক এবং মাল্লাপ্পা নায়কের কথাও ছিল বলে মনে করেন অনেক ইতিহাস গবেষকই। দাক্ষিণাত্যে একটি ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত ও জনকল্যাণমূলক রাজ্য যে প্রথম রাজ রাজ চোল শিব পশুপতিকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বৃহদেশ্বর মন্দিরের অস্তিত্ব থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরীয়রা যদি আবু-সিম্বেলের দেবালয় নিয়ে গর্বিত হন, কাম্বোডিয়ার সাংস্কৃতিক আভিজাত্য যদি প্রকাশ পায় আংকোরভাট বিষ্ণু মন্দিরে, মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার সৌষ্ঠব যদি বিধৃত থাকে উর-নাম্মুর জিগ্‌স্তরটির মধ্যে তাহলে প্রাচীন মন্দিরময় ভারতের গরিমাকে স্বর্ণাক্ষরে রচনা করা যেতেই পারে বৃহদেশ্বর মন্দিরের স্থাপত্য মহাকব্যকে বর্ণনা করে।

পর্যটন মানচিত্রে মোগলমারি এবং কুরুম্বেরা খাসতালুক হতে পারে

বিপ্লব বরাট

হিউয়েন সাঙ্ বর্ণিত তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্যতম প্রধান বৌদ্ধবিহার মোগলমরি দেখার সুযোগ পেলাম। অদম্য উৎসাহে শুভদীপ সান্যালকে সঙ্গে নিয়ে সীমিত গণ্ডি অতিক্রম করে অসীমের শিল্পকীর্তিকে স্পর্শ করার অনুভূতি হলো। বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে সকাল ৭টায়। ট্রেন থেকে নামলাম খড়্গপুর রেলওয়ে স্টেশনে ৯.৩০ মিনিটে। স্টেশন থেকে বের হলেই বাসস্ট্যান্ড। বাস আমাদের এক ঘণ্টার মধ্যে বেলদাতে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তার গন্তব্য পথে। বেলদা কলেজ রোড ধরে এক কিলোমিটার হাঁটা পথ ধরে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার প্রচীন দেউলি গ্রামে উপস্থিত হলাম। পূর্বমুখী পাথরের তৈরি সপ্তরথ নকশায় নির্মিত পীঢ়া দেউলটি জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি। দেউলটি যেন ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করছিল। ওড়িশা মন্দিরশৈলীর এই যোগী দেউলটির সৃষ্টি একেবারে আঞ্চলিক প্রকৃতির অকৃপণ ঐশ্বর্যের বাতাবরণের ভূমিতে। যোগী দেউলের নামানুসারেই গ্রামের নাম হয়েছে দেউলি। এছাড়া এখানে নাথ সম্প্রদায়েরও বিশেষ প্রসার ঘটেছে। যোগী দেউলের ডান পাশে মাড়ো পুষ্করিণী। মাড়ো শব্দের অর্থ দেবমন্দির। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কার্তিক মাইতি ও যোগী দেউলের সেবাইত সাহু পরিবারের লোকেরা দেউলটি সংস্কারের জন্য এগিয়ে এসেছেন। সরকরি রেকর্ডে বেলদা থানা ও নারায়ণগড় ব্লকের অধীন ৩২১নং জে.এল.ভুক্ত। নাথ সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে এই যোগী দেউল ও অদূরে এই গ্রামেই চম্পকেশ্বর শিবের একটি মন্দির আছে। চম্পকেশ্বর জীউয়ের দক্ষিণমুখী রেখ দেউলটির গঠন শৈলী দেখে মনে হয় যে এটি আনুমানিক বারো-তেরো শতকে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটিকে বর্তমানে আগাগোড়া সংস্কার করা হয়েছে। এর ডান দিকে শীতলা মন্দির বিদ্যমান। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় কষ্টিপাথরের একটি বৃষভমূর্তি, পাল-সেন যুগের স্থাপত্যের কিছু ভাঙা নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। চম্পেকেশ্বর শিব মন্দিরটির স্বর্গীয় সুষমায়

আমোদিত চারপাশ। বেলদা থেকে বাসে চড়ে ১০ কিলোমিটার পথ পার হয়ে পৌঁছালাম মনোহরপুর বাস স্টপেজে। ঐতিহ্যের খোঁজে যোগী দেউল, মোগলমারি, কুরুম্বেরা দুর্গ, হাইওয়ে থেকে ডানদিকের সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তায় একটু হেঁটে যেতে যেতে দেখতে পেলাম বাঁ দিকে বড়ো হরফে লেখা রয়েছে 'মোগলমারি বৌদ্ধ বিহার'। গীতবিতানের সহস্র সংগীত যেমন সহস্র ভাবের দ্যোতক, তেমনি এই 'শ্রী বন্দক মহাবিহারের' সুপ্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্য অলংকরণের নকশাগুলিও সহস্র ভাবের ব্যঞ্জক। পোস্ট অফিস নেকুড়সেনী ও দাঁতন ১নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে প্রত্নক্ষেত্রটি অবস্থিত। প্রত্নগবেষকদের দাবি রহস্যময় দন্তপুর মহাবিহারই আসলে অতীতের অমরাবতী তথা আজকের মোগলমারি। দাঁতনকে সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী বন্দর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। গৌড় রাজা শশাঙ্কের সময়ে দণ্ডভুক্তির গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। এই দণ্ডভুক্তিই পরবর্তীকালে দাঁতন হয়েছে বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অভিমত। শুধু শশাঙ্ক নয়, তার আগেও এখানে জনবসতি ছিল বলে তাম্রলিপ্ত থেকে জানা যায়। স্থানীয় গবেষক অতনু নন্দন মাইতি মোগলমারি বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে পরিচয় করালেন। প্রত্নস্থলের কয়েকটি সিঁড়ি শেষে একটা মঞ্চের মতো ঘর। সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'সখী সেনা ঢিবি' মোগলমারী তরুণ সেবা সঙ্ঘ ও পাঠাগার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক প্রয়াত অশোক দত্ত পূর্ব পরিচয়ের সূত্রে দাঁতন কলেজের প্রাক্তন ইতিহাস-প্রেমী শিক্ষক নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনিই অশোকবাবুকে সখীসেনা ঢিবি পরিদর্শন করান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতত্ত্ব বিভাগ এই ঢিবিতে উৎখনন শুরু করে ২০০৩-০৪ সালে। এখনও পর্যন্ত মোট নয় দফায় খননকার্য হয়েছে। উৎখননে বৌদ্ধবিহার, স্তূপ, রাজা সমাচার দেবের মিশ্র ধাতুর মুদ্রা, স্বর্ণ লকেট ও মুকুট, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য-সহ ৭২টি ব্রোঞ্জ মূর্তি আবিষ্কার করা হয়েছে, যা বর্তমানে বেহালার স্টেট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এখানে গুপ্ত পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মী অক্ষর যুক্ত সিল ও সিলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাহান্ন রকমের নানা মাপের ইট পাওয়া গেছে। এই প্রাচীন স্থাপত্যটি গুপ্তোত্তর যুগের বলে অনুমান করা হয়। বিখ্যাত প্রত্নক্ষেত্রগুলি হয় পুরাণ বা মহাকাব্যের সঙ্গে জুড়ে যায়। সখীসেনা ঢিপির নাম মধ্যযুগের রোমান্টিক মিথের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। জনমানসে কথিত আছে, ওড়িশার মধ্যযুগীয় রাজা বিক্রম কেশরীর বিদুষী কন্যা সখিসেনা (মতান্তরে শশীসেনা) এই ঢিপির উপর একটি পাঠশালা স্থাপন করেন। এইখানেই জনৈক কোটাল পুত্র অহিমানিকের সঙ্গে সখীসেনার প্রেম হয়। তাদের ব্যর্থ প্রণয়ের সাক্ষী নাকি এই ঢিপি। বাঁকুড়ার কবিরাজ ফকির রাম দাস 'সখিসেনা' বলে একখানি পুঁথি লিখেছিলেন। যাইহোক ঢিবির খননের ফলে এই ত্রিরথ কাঠামোর ঠিক কেন্দ্রে একটি আয়তক্ষেত্রাকার বেদী পাওয়া যায়। ঢিবির দক্ষিণে খননের ফলে ছোটো বর্গক্ষেত্রাকার চারটি বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। সমবেত উপাসনার জন্য খোদিত হতো চৈত্য এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল এই বিহার। আমরা ভুলে যাই প্রতিটি যুগই নিজেকে আধুনিক মনে করে এবং এই শূন্য কক্ষগুলি এক সময় উষ্ণ স্পন্দিত মানব জীবনে পূর্ণ ছিল। ভুলে যাই কক্ষগুলির প্রতিটি রেখা ও বক্র রেখা মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

মহাবিহারের একটি অংশে খড়ের বা টিনের চালাঘরের মতো ঢাকা দেওয়া করিডোর রয়েছে। সেখানে একটু নীচে নামতে হলো। কুলুঙ্গিতেই অপূর্ব শিল্প সুষমার স্টাকো দ্বারা নির্মিত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি। বিভিন্ন মুদ্রায় পরপর একাধিক বৌদ্ধ মূর্তিগুলিতে কোনো বাণী বা কথা নেই— শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকের মনে বৌদ্ধ ধর্মের নিষ্কাম কর্মের অনুশাসনের সঙ্গে শিল্পীর ক্লাসিক দক্ষতার ভাব জাগিয়ে তোলা। তা যেন সা রে গা মা সাংকেতিক ধ্বনির সাহায্যে ধ্রুপদী সঙ্গতের আলাপন। কেবলমাত্র শিক্ষা নয়, এখানে বহু মানুষ আসতেন দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্যও। কেউ কেউ বহু দূর থেকে বুদ্ধের পায়ে অর্ঘ্য নিবেদনের জন্যও। যে অর্ঘ্যের নমুনা রয়েছে একটি ঘরে। এই ঘরটি এখন মিউজিয়াম। এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে গুপ্ত আমলের কারুকার্য করা মৃৎপাত্র। বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্রের মধ্যে তাম্রাশ্মীয় পর্বের নিদর্শন। যেমন কৃষ্ণ লোহিত মৃৎপাত্র— পুরাতত্ত্বের পরিভাষায় যাকে Black and Red Ware বলে। এছাড়া লাল, কালো ও ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র, পোড়া মাটির লেখ যুক্তনাম, মুদ্রা, Seal, কারুকার্যমণ্ডিত ছিদ্র যুক্ত নল, পোড়া মাটির প্রদীপ রয়েছে। উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে প্রত্নসম্পদগুলো নষ্ট হচ্ছে। যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সাম্প্রতিককালে জার্মানির হ্যানেভার শহরের লিবনিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মোগলমারি পরিদর্শন করেন। দাঁতন ১নং ব্লকের অন্তর্গত সরশঙ্কা দিঘির সমীক্ষা করেন। সদ্য আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম দিঘির নাম সরশঙ্কা। যদিও বঙ্গসংস্কৃতির প্রচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যটি আমাদের উদাসীনতায় কতদিন এই ভাবে অবহেলিত ও অনাদরে টিকে থাকবে, সেটাই হলো চিন্তার বিষয়। সংরক্ষণের নামে শুধু মাত্র নির্দেশিকার বোর্ড লাগিয়ে দায়িত্ব সারা হয়েছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ একটু উদ্যোগ নিলে বাঙ্গলার ঐতিহ্য টিকে থাকবে।

মোগলমারি সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মিটিয়ে কুরুম্বেরা দুর্গ পরিদর্শনে গেলাম। মোগলমারি হাইওয়েতে নিয়মিত বাস চলে, সেই বাসে করে বেলদা কেশিয়াড়ী মোড় থেকে পশ্চিম পথে কুকাই স্ট্যান্ড পৌঁছাতে আধ ঘণ্টা সময় লাগলো। কেশিয়াড়ী থানার অন্তর্গত গগনেশ্বর গ্রাম (জে.এল. নং ১৫৪) এক সময় তসর শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের আওতায় সংরক্ষিত এই গ্রামের কুরুম্বেরা দুর্গ। এই পুরাকীর্তিটি অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলছে। কুরুম্বেরা দুর্গটি ল্যাটেরাইট ব্লক দিয়ে তৈরি। সুখ্যাত মাকড়া পাথরের দুর্গ। এই মাকড়া শব্দটি স্থানীয় ভাষায় 'কুরুম' বলে। বেড়া কথাটির অর্থ ঘেরা স্থান। কুরুম্বেরা দুর্গের বিশালাকার আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ১৭২ ফুট ৯ ইঞ্চি ও পূর্ব-পশ্চিমে ২৫৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ছন্দোময় উচ্ছ্বাসে মনে হলো এক রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করলাম। স্থাপত্য শিল্প নৈপুণ্যের সমাহারে সুন্দরের মূল সুরটি বেজে ওঠে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত পূর্বদিক লাগোয়া একটি সপ্তরথ দেউলের ভগ্নাবশেষ এবং পশ্চিমদিকে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ লক্ষ্য করলাম।

দুর্গের ভিতরে গগনেশ্বর শিবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুহম্মদ তাহির ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি বানিয়ে ছিলেন। কলকাতা সার্কেলের আরকিওলজিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট শুভ মুজমদার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী 'মন্দির গাত্রে ওড়িশার ভাষায় লিখিত যে প্রস্তর ফলকখানি আছে, তাতে দুটি অক্ষর পাওয়া গিয়েছে। 'বুধবার' ও 'মহাদেবঙ্ক মন্দির'। জনশ্রুতি হলো, ওড়িশার রাজা গজপতি কপিলেন্দ্রদেব খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই শিব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মোগল সম্রাজ্যের পতনের পর আঠারো শতকের প্রথম দিকে মারাঠাদের ওড়িশায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এটিও হস্তগত হয় এবং কুরম্বেরাকে দুর্গরূপে ব্যবহার করেন। যাই হোক, কুরুম্বেরা দুর্গটি নিজস্ব স্থাপত্য কারুকলায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দেশের পর্যটন মানচিত্রে ঐতিহ্যময় যোগী দেউল, মোগলমারি, কুরুম্বেরা দুর্গ খাসতালুক হয়ে উঠবে। আমরা সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছি।

(বাঁকুড়ার আঞ্চলিক ইতিহাসের লেখক)

কেবল বিজেপি ঠেকাও ইস্যুতে দিদি 'দাদা' হতে পারবেন কি?

দুর্গাপদ ঘোষ

এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনী ফলাফলে অতিরিক্ত উৎসাহিত হয়ে যাঁরা দিদিকেই দেশের 'দাদা' মনে করে তাঁর আঁচল ধরে মোদী হঠানোর স্বপ্ন দেখছেন তাঁদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে 'খেলা হবে', 'খেলা হবে' বলে গলার শিরা যত বেশি ফোলানো হোক না কেন, খেলার ময়দানে কিন্তু সব পরিস্থিতিতে একই ছকে বা একই কৌশলে খেলা হয় না। বাংলাদেশি মুসলমান অনুপ্রবেশের ঢলের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনচরিত্রের প্রেক্ষিতে এবার যে কৌশলে খেলা হয়েছে দেশের আরও যে চার রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে কিন্তু সেই একই ছকে খেলা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সরকারিভাবে মুসলমানদের সংখ্যা ২৫ শতাংশ বলা হলেও প্রকৃত শতাংশ হলো ৩৬-এরও বেশি।

২০১১ সালের জনগণনার পর পরই এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল। তা নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় একটা রিভিউয়ের পর ১১ শতাংশ কমিয়ে ২৫ শতাংশ ঘোষণা করা হয়। বিগত ১০ বছরে মুসলমান জনসংখ্যা যে আরও অনেক বেড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরকে বাদ দিলে ভারতের অন্য কোনো রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা এত বেশি নয়। এমনকী কেরলেও নয়। সেখানে তাঁদের সংখ্যা ২১.৮ শতাংশের মতো। তবে মুসলিম লিগের কারণে সেখানে মুসলমান ভোটাররা অনেকটা জোটবদ্ধ হয়ে লিগকেই ভোট দিয়ে থাকেন। এবার নিয়ে কেরালায় পরপর দু'বার জিতে সরকার গড়ে এলডিএফ বা বামফ্রন্ট ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কারণটা বলা বাহুল্য, পশ্চিমবঙ্গের ঠিক উলটো। এ রাজ্যে বিজেপি-কে ঠেকাতে মুসলমানরা যেমন এককাট্টা ভাবে তৃণমূলকে ঢেলে ভোট দিয়েছেন কেরলে তেমনি মুসলিম লিগকে

ক্ষমতার থেকে দূরে রাখার জন্য হিন্দুরা এককাট্টা হয়ে ভোট দিয়েছেন বামেদের। অর্থাৎ কেরলে এবার হিন্দু ভোটের ফলেই মেরুকরণ ঘটেছে। অথচ সে রাজ্যের হিন্দুরা কিন্তু কোনোসময়ই দলবদ্ধভাবে কমিউনিস্ট সমর্থক নন। বরং বামফ্রন্ট সরকার ইতিপূর্বে দেবস্বম বোর্ড গঠন করে মন্দিরগুলোর পরিচালন ভার সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ায় হিন্দু মুন্নানি-সহ বেশিরভাগ হিন্দু সংগঠন বাম-বিরোধী। তা সত্ত্বেও এবার সেখানে পশ্চিমবঙ্গের উলটো 'খেলা' হয়েছে।

স্বাধীনতা তথা দেশভাগের আগের ঘটনা বাদ দিলেও স্বাধীনতার পর এদেশে কংগ্রেস ও বামেরা সব সময়ই 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র আড়ালে সংখ্যালঘু তকমায় মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক। বহু ঘটনায় তার উদাহরণ তথা প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে (তখন লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন হতো একই সঙ্গে) বামেরাই প্রথম মুসলিম লিগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কেরলে সরকার গড়ে। প্রয়াত ইএমএস নাম্বুদিরিপাদ সেই জোট মন্ত্রীসভায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে 'এ মুসলিম লিগ সে মুসলিম লিগ নয়' বলে সাফাই গাইবার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস সরকার গড়তে না পেরে লিগকে 'সাম্প্রদায়িক' বলে কটাক্ষ করে। পরের নির্বাচনে সেই কংগ্রেসই নাম্বুদিরিপাদের তত্ত্ব খাড়া করে লিগ ও 'নায়ার কংগ্রেস' (বস্তুত খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দল)-কে সঙ্গে নিয়ে জোট সরকার তৈরি করে। প্রসঙ্গত, এখন কেরলে খ্রিস্টানদের সংখ্যা প্রায় ২১ শতাংশের মতো এবং তাঁরা নায়ার কংগ্রেসকে তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক দল হিসেবে দেখেন। এইভাবে তখন থেকে উল্লেখিত দুই ধর্মীয় গোষ্ঠীর দলকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে একবার এলডিএফ তো একবার কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডিএফ)-এর সরকার চলে আসছিল। ফলে লিগ নেতাদের ধারণা হয়েছিল কেরলে তাঁদের বাদ দিয়ে বাম-কংগ্রেস কোনোপক্ষের সরকার গড়া সম্ভব নয়। এমনিতে কেরলে হিন্দুরা খুব ধর্মনিষ্ঠ হলেও ভোটের ব্যাপারে কোনোদিন এককাট্টা ছিলেন না।

উলটোদিকে মুসলমানরা মওকা বুঝে যখন যে সরকার গঠিত হয়েছে তখনই তাঁদের দাবি বাড়িয়ে যাওয়ার কৌশল খাটিয়ে এসেছেন। কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর জমানায় মালাপ্পুরম জেলাকে 'মুসলমান জেলা'র দাবিও আদায় করে নিয়েছেন। নিরন্তর চাপের মুখে পড়তে হয়েছে সে রাজ্যের হিন্দুদের। মুসলিম লিগের এই চাপ সৃষ্টির ব্যাপারটা তুঙ্গে ওঠায় হিন্দুরা ক্রমে নিজেদের কোণঠাসা বোধ করতে করতে ইদানীং তাঁদের পিঠ প্রায় দেওয়ালে ঠেকে যাবার অবস্থায় চলে আসে। কিন্তু ২০১২ সলে সিপিএমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পিনারাই বিজয়ন, যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর দলের মধ্যেই পামতেল দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, তিনি নির্বাচনের মুখে যেই বুঝতে পারলেন

ফ ঃ ৫

যে হিন্দু মুন্নানির সঙ্গে জোট বেঁধে বিজেপি তার পায়ের তলায় মাটি শক্ত করে ফেলছে এবং লিগ ও লিগ সঙ্গীদের বিরুদ্ধে 'সাম্প্রদায়িকতার' অভিযোগ তুলে হিন্দু ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ করতে চলেছে, তার আগের নির্বাচনে ১১.৩ শতাংশ ভোটও দখল করে ফেলেছে তখন পরীক্ষামূলকভাবে কৌশল বদল করে লিগকে বাদ দিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। লিগের সঙ্গে জোট বাঁধে কংগ্রেস। বিজেপির সেবার অন্তত ৫-৭টা আসন পাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। লিগকে সঙ্গী না করায় বিজয়নকে দলের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভিএস অচ্যুতানন্দনের সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সেবার নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে হিন্দুরা যখন বুঝলেন যে বিজেপির একার পক্ষে সরকার গড়া সম্ভব নয়, উলটে তারা ভোট কেটে নিলে লিগকে সঙ্গে নিয়ে ওমান চাণ্ডীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস তথা ইউডিএফ সরকারে আসীন হতে পারে তখন কৌশল পালটে এলডিএফ-কে ভোট দেন।

তার ফলে কেরলে বস্তুত প্রথমবার মুসলিম লিগ বর্জিত সরকার গঠিত হয়। সেবার বিজেপি পায় মাত্র ১টা আসন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে 'মেট্রোম্যান' হিসেবে খ্যাতিসম্পন্ন শ্রীধরণকে মুখ্যমন্ত্রী মুখ করে মাঠে নামায় বিজেপির কমপক্ষে ২ অঙ্ক পার করার সম্ভাবনা দেখছিলেন রাজনৈতিক মহল। কিন্তু এবারও সেই একই ঘটনা ঘটেছে। হিন্দুরা যখন দেখলেন যে ১০-১৫টা আসন পেলে বিজেপি হয়তো কিংমেকার হলেও হতে পারে, কিন্তু সমর্থন কাকে করবে? বিজেপির ঘোষিত নীতি অনুযায়ী কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও লিগ তাদের কাছে ব্রাত্য। তখন সেই একই কৌশল নিয়ে মুসলিম লিগকে সরকারের বাইরে রাখতে এককাট্টাভাবে ভোট দিয়ে ফের বিজয়নকে জিতিয়েছেন। বিজেপি একটাও আসন পায়নি।

এখন রাজনৈতিকভাবে হিন্দুরা যত ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তাঁদের প্রয়োজন তত বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে, যে বামেরা ইসলামি মৌলবাদ নিয়ে কোনোদিন টুশব্দটিও করেননি, গত ২৪ আগস্ট তা নিয়ে মুখ খুলেছেন বিজয়ন। আফগানিস্তানে তালিবানি বর্বরতা সম্পর্কে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, ধর্মীয় মৌলবাদ বিশ্বের দেশগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে পারে আফগানিস্তান থেকে সেই শিক্ষা নেওয়ার সময় এসেছে। এই প্রতিবেদকের ধারণা, কেরলে আগামীদিনে যারা মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে নির্বাচনে যাবে তারা আরও বেশি আসনে জিতে সরকার গড়বে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের 'খেলা হবে'-র কৌশলে তাদের সরকারে ফিরে আসা দেখে যারা সারা ভারতেও একই 'খেলা হবে' এবং মোদীর বদলে দিদি গদিনসীন হবেন বলে উদ্বাহু হয়ে নাচছেন তাঁদের একবার পর পর দুবার কেরালায় ভোটচিত্র পর্যালোচনা করে দেখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

সবচাইতে বড়ো কথা হলো, অনেক বছরের পোড় খাওয়া বা যাকে বলে 'হিমহেড়ে' রাজনীতিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবাইকে মোদীর বিরুদ্ধে একজোট করার জন্য মাঠে নেমেই ঠাওর করতে পেয়েছেন যে তাঁর নিজের রাজ্যে খেলা আর দিল্লি দখলের খেলা ঠিক একরকম নয়। সেজন্য তেড়েফুড়ে উঠে দিল্লিতে গিয়েও তিন দিনের সফরের দ্বিতীয় দিনেই ২৮ জুলাইয়ে একাধিকবার বলে এসেছেন যে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন সেটা ঠিক করার সময় এখনো আসেনি। তা পরে ঠিক হবে। যিনি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী মুখ নিয়ে সভায় সভায় প্রশ্ন তুলে কটাক্ষ করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর মুখের বেলায় তাঁর মুখে অন্য সুর কেন? এ রাজ্যে সরকার গড়ার পর তিনিই তো উদ্যোগী হয়ে দিল্লিতে দৌড়েছিলেন। তাহলে মোদীর বিকল্পের প্রশ্নে তাঁর সুর এত নরম হয়ে গেল কী কারণে? কারণ, দীর্ঘদিন ধরে বহু তাবড় নেতাকে খুব কাছ থেকে দেখে তিনি খুব ভালোই জানেন যে, প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি গেলার জন্য অনেক বড়ো বড়ো রাজনৈতিক নেতা হাঙরের মতো হাঁ করে বসে আছেন। আরও যে ক'জন হাঁ করে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কারো কারো সেই দিবাস্বপ্নেই এন্তেকাল ঘটে গেছে।

এনসিপি নেতা শরদ পওয়ার তো প্রথমে মমতার সঙ্গে দেখাই করতে চাননি। মমতা বিজেপি-বিরোধী জোটের তৎপরতা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এনসিপি-র নেতা নবাব মালিক তড়িঘড়ি শুনিয়ে রাখেন যে বিজেপির বিরুদ্ধে সবাইকে একজোট করার চিন্তাভাবনা করছেন তাঁদের দলনেতা শরদ পাওয়ার। ইঙ্গিত হলো পাওয়ার এখনো প্রধানমন্ত্রী হবার স্বপ্ন ত্যাগ করেননি। ইতিমধ্যে কংগ্রেস নেত্রীও গত ২০ আগস্ট মোদী বিরোধীদের ডেকে বৈঠক করে বসে আছেন। সোনিয়ার সেই ভার্চুয়াল বৈঠকে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ডিএমকে, শিবসেনা ও তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া বাকিরা কোনো ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। তাছাড়া রয়েছে অসমে বদরুদ্দিন আজমলের দল এআইইউডিএফ এবং কেরলে মুসলিম লিগ। আর কেরল কংগ্রেস (মানি), লোকতান্ত্রিক জনতা দল, ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপি জনতা দল (এস) ইত্যাদির মতো গোটা সাতেক দল যাদের ভারতের রাজনীতিতে বর্তমানে স্থান হলো একেবারেই প্রান্তিক। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হলো, আম আদমি পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, বিজু জনতা দল, এআইএ ডিএমকে, অন্ধ্রপ্রদেশের ওয়াই এস আর কংগ্রেস, তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতির মতো তুলনামূলকভাবে বড়ো দলগুলোই যোগ দেয়নি। যোগ দেয়নি অকালি দলও। সোনিয়ার ওই বৈঠকে যোগ দেওয়া মোট ১৭টা দলের মধ্যে মাত্র ৩টে দল ছাড়া বাদবাকিদের অবস্থানের কথা সবাই জানেন। তবুও '১৭টা দল যোগ দিয়েছে, ১৭টা দল যোগ দিয়েছে' বলে যেভাবে প্রচারের ঢাক পেটানো হচ্ছে তার উলটো দিকের চিত্রটা কিন্তু অন্যরকম। যারা সোনিয়ার বৈঠকে যোগ দেয়নি এবং যারা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সঙ্গে রয়েছে তাদের সংখ্যা যোগ করলে ১৭-র চাইতে আরও প্রায় ১০টা দল বেশি হবে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং গুজরাট থেকে মণিপুর সারা দেশের প্রায় সব রাজ্যেই সেইসব দলের কোনো না কোনো রাজ্যেই কারো না কারো কিছু না কিছু শক্তি রয়েছে।

সুতরাং ২০২৪-এর লক্ষ্যে বিজেপি-বিরোধীরা সকলেই একজোট হয়ে মহাজোট গড়বে এবং বিজেপির বিপরীতে একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেবার লক্ষ্য পূরণের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ। এটা মমতাও যেমন মালুম পাচ্ছেন, তেমনি ঠাহর করতে পারছেন সোনিয়াও। তবে সোনিয়ার লক্ষ্য নিজে প্রধানমন্ত্রী হওয়া নয়, ছেলে রাহুলকে বসানো। ২০০৪ সালে তিনি নিজে প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. এপিজে আবদুল কালামের কাছে গিয়েও 'অন্তরাত্মার ডাকে' ফিরে এসেছেন।

সোনিয়া জানেন যে ইতালির নাগরিকত্ব ত্যাগ না করে ভারত ও ইতালির দ্বৈত নাগরিকত্ব বজায় রাখা পর্যন্ত তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মসনদে আসীন হতে পারবেন না। এখনো যা পরিস্থিতি তাতে কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোনো জোট-মহাজোটের পক্ষেই মোদীর আসনে বসা সম্ভব নয়। আর কংগ্রেস যে নেহরু পরিবারের কাউকে কিংবা নিদেনপক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে নেহরু পরিবারের কোনো বশংবদ নেতাকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নেবে না এটা সমাজবাদী পার্টির নেতা মুলায়ম সিংহ যাদবের পরিণতি দেখে দিদি যে তা বুঝতে পারবেন না, এতখানি অপরিণত রাজনৈতিক নেতা বলে তাঁকে মনে করার কারণ নেই। তিনি অনেক নেতারই বাসনার কথা জানেন।

প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসার স্বপ্ন দেখতে দেখতে চোখ বুজেছেন এক সময়ের একজন সম্ভাবনাময় দক্ষিণী নেতা তেলুগু দেশম পার্টির টিডিপি প্রতিষ্ঠাতা তথা অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এনটি রামারাও। উত্তরেরও এক নেতা হরিয়ানার প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী চৌধরী দেবীলালও নতুন দিল্লির বোটক্লাবে লাখ পাঁচেক লোকের জনসমাবেশ করে মনে করেছিলেন তিনিই একমাত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার উপযুক্ত। অবশ্য রাজনীতির ডামাডোলে আর এক জাঠ নেতা উত্তরপ্রদেশের চৌধরী চরণ সিংহের মতো তিনিও উপপ্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। কিন্তু চরণ সিংহের মতো তাঁর 'স্বপ্ন' আর পূর্ণ হয়নি। রাজনীতির হ য ব র ল-এ একবার প্রয়াত জ্যোতি বসুও ওই কুর্সির দিকে তাক করেছিলেন। কিন্তু সিপিএম সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত হরকিষেণ সিংহ সুরজিৎ তাঁকে নিরস্ত করেন। নাহলে শেষ পর্যন্ত জ্যোতিবাবুর কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারত সেটা এখন একটা গবেষণার বিষয়। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই 'মারাঠা ক্ষত্রপ' শরদ পাওয়ার তো প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের সঙ্গে জনসভায় লোকসংখ্যা দেখানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কুল না পেয়ে সোনিয়াকে 'বিদেশিনী' কটাক্ষ করে কংগ্রেস থেকে কার্যত বিতাড়িত হয়ে নিজের আলাদা দল ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) বানিয়ে এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে সবচাইতে 'ট্র্যাজিক হিরো' বোধহয় উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিংহ যাদবকেই বলা যেতে পারে। ২০১২ সালে পুনরায় উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে জেতার পর তাঁকেই তাঁর দলের পরিষদীয় নেতা নির্বাচন করেন এসপি বিধায়করা।

কিন্তু তাঁর স্তাবকরা তাঁকে প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্য নেতা বলে মোসাহেবি করতে থাকায় তিনি সেই কুর্সির দিকে তাকিয়ে নিজে তাঁর ছেলে অখিলেশ যাদবকে মুখ্যমন্ত্রী করার প্রস্তাব রাখেন এবং সেবার অখিলেশ মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কুর্সির ধারেকাছে পৌঁছতে না পেরে সমাজবাদী পার্টির স্বপ্রচারিত 'নেতাজী' যখন ছেলের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ফিরে পেতে চাইলেন ততদিনে শ্রীমান অখিলেশজী ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। বাবাকে কুর্সি ছাড়তে অস্বীকার করলেন। ফলে মুলায়মের অনেক কষ্টে পাড়া ফল আমও গেল, ছালাও গেল। এখন তো বলতে গেলে মুলায়মের রাজনৈতিক জীবন প্রায় শেষ। অখিলেশই দলের সভাপতি। ২০১৭ সালের নির্বাচনে বিজেপি সমাজবাদী পার্টি সরকারকে উৎখাত করে তিন-চতুর্থাংশ আসনে জিতে উত্তরপ্রদেশে সরকার গড়েছে।

> "কেবল বিজেপি ঠেকানোর খেলায় দিদি 'দাদা' হতে পারবেন কি? লাখ নয়, কোটি টাকার প্রশ্ন। ভাইপোর হাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিল্লি দখলের পথ ধরলে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক পরিণতি কিন্তু মুলায়ম সিংহ যাদবের মতো হতে পারে।"

মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন গোরক্ষ পীঠের মহন্ত যোগী আদিত্যনাথ।

২০২১ সালে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুলায়মের তৈরি করা দল গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে খোদ মোদীর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসী, রামজন্মভূমি- কেন্দ্রিক মথুরা জেলায় তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করায় এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে বিজেপি-বিরোধী দলগুলো ২০২২ সালে অনুষ্ঠিতব্য বিধানসভা নির্বাচনকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের 'ট্রায়াল রেস' বলে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারপর পরই 'খেলা' অন্যদিকে ঘুরে গেছে। রাজ্যে ৭৫টা জেলা পরিষদ নির্বাচনে আপনা দল এবং সমর্থিত নির্দলকে নিয়ে ৭০ আসনেই প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। বাকিরাও উচিত আসন পেয়েছে। তার কয়েকদিনের মধ্যে ব্লকপ্রধান নির্বাচনে মোট ৬২০ আসনের মধ্যে বিজেপি একাই ৪২৫ আসনে জিতেছে। বারাণসী, অযোধ্যা, মথুরা এমনকী সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর লোকসভা কেন্দ্র রায়বেরেলি ও আমেথি জেলায়ও প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। আর উল্লেখিত তিন হিন্দু তীর্থ-সমৃদ্ধ জায়গায় সমস্ত ব্লক পঞ্চায়েত আসনের সবগুলোই চলে এসেছে বিজেপির দখলে। এর কয়েক মাস আগেই দক্ষিণে হায়দরাবাদের পুর নির্বাচনে ভোটেও ৪৯ আসন দখল করেছে বিজেপি। ক্ষমতাসীন তেলেঙ্গানা সমিতি পেয়েছে ৫৫টা। তেলেঙ্গানা থেকে একমাত্র উপনির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী। এতেই প্রমাণিত যে নির্বাচনের মাঠে 'খেলা হবে' বলে নেমে পড়লেই বিশেষ কোনো এক পক্ষের অনুকূলেই খেলা হবে এমন ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক।

মমতার মধ্যে নেতৃত্বের গুণ থাকলেও জোট রাজনীতিতে তাঁর মানিয়ে চলার ব্যাপরটা আদপেই পরীক্ষিত নয়। তাঁর মানসিকতা ও ভাবভঙ্গি সব সময়ই অসহিষ্ণু (অ্যাডামেন্ট), বোঝাপড়ার (অ্যাডজাস্টমেন্ট) নয়। কংগ্রেস তাঁর নেতৃত্বের গুণের প্রমাণ পায় ১৯৭৪ সালে বিহার আন্দোলনের সময়। যেদিন মধ্য কলকাতার রাস্তায় লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের গাড়ির ওপর উঠে নাচানাচি করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর উগ্র মনোভাবের কারণে তাঁকে কিছুতেই রাজ্য

কংগ্রেসের সভাপতি করেনি। অনেক কংগ্রেস নেতার সঙ্গে সংঘাত বাধিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে কংগ্রেস ছেড়ে নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেস গড়েন। সেই থেকে একাই লড়ে এসেছেন। একবারই মাত্র কিছুদিনের জন্য বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে রেলমন্ত্রীর মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু যিনি সিপিএমের সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো নেতাকে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে পরাজিত করে প্রথম লোকসভায় যান তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভাতেও টিকে থাকেননি। কিংবা নিজের মানসিকতার কারণে টিকে থাকতে পারেননি। একটানা ৩৩ বছরের সিপিএম সরকারের পতন ঘটিয়ে নিজের জোরেই মুখ্যমন্ত্রী হন ২০১১ সালে। অনেক বার সিপিএম মস্তানদের হাতে মার খেয়েছেন। হাজারার মোড়ে লালু আলম রড দিয়ে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল।

তার আগে কংগ্রেসের সাংসদ থাকাকালে এবং নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং থেকে তাঁকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত যেমন কারো নেতৃত্ব বরদাস্ত করেননি তেমনি সবসময় নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার দাপট চালিয়ে এসেছেন। সেই তিনি কি এখন কংগ্রেস বা অন্য কোনো আঞ্চলিক দলের কোনো নেতার নেতৃত্বকে কুর্নিশ করে চলবেন? বিশেষ করে কংগ্রেসের যারা পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, ছত্তিশগড় ও অসমে বিজেপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সেখানে লোকসভায় রয়েছে ২৫০-এর বেশি আসন? পক্ষান্তরে সমস্ত বিজেপি-বিরোধীরা তাঁর দাবড়ে চলা নেতৃত্ব মেনে নেবেন কি? সবচাইতে বড়ো রাজ্য উত্তরপ্রদেশে এখনই অখিলেশ-মায়াবতীর মধ্যে সংঘাতের রাজনীতি চলছে। মায়াবতী বিজেপিকে ইস্যুভিত্তিক বিশেষ করে ওবিসি সংরক্ষণের ইস্যুতে সমর্থন করার কথা আগাম ঘোষণা করেছেন। এই একটা রাজ্যেই ৮০টা লোকসভা আসন রয়েছে। মমতা লাফালাফি করলেও মুসলমান তোষণের বা মেরুকরণের ইস্যুতে শিবসেনা নেতারা মমতাকেই মেনে নেবেন এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি। আবার কট্টর হিন্দুত্ববাদী শিবসেনা মহারাষ্ট্রের মায়া ত্যাগ করে জোটে এলেও অন্যরা হিন্দুত্বের ইস্যুতে জোটে শামিল হতে রাজি হবেন কিনা তাতে যথেষ্ট বড়ো প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাচ্ছে।

বিশেষ করে বামেরা ও সমাজবাদী পার্টি। মহারাষ্ট্রেও লোকসভার ৪৮টি আসন রয়েছে। হিসাব মতো দেখা যাচ্ছে কেবল উল্লেখিত রাজ্যগুলেতেই লোকসভার আসন সংখ্যা নয় নয় করেও প্রায় ৪০০-র কাছাকাছি, তার সিংহভাগ, অন্তত ২৪০-২৫০ আসন না পেলে কোনো জোট-মহাজোটের পক্ষেই কেন্দ্রে সরকারের ধারে কাছে পৌঁছনোও সম্ভব নয়। বাস্তবে যা প্রায় অসম্ভব আরও একটা বিষয় রয়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের মাঠে 'খেলা হবে' বলে বিজেপি বিরোধীরা কেবল মুসলমানদের নিয়ে একতরফা খেলবেন আর হিন্দুরা খেলার ময়দান ছেড়ে খালিপায়ে লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে যাবেন এমন ধারণা করা আর মূর্খের স্বর্গে বাস করার সমান। ২০২৪-এ কী হতে পারে না পারে তার একটা ভাসা আন্দাজ মিলতে পারে ২০২২-এ উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনে। সে রাজ্যে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্লক এবং জেলা পরিষদ প্রধান নির্বাচনে তার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত মিলেছে। তাছাড়া সে প্রদেশে জনচরিত্রের মুড মমতা ব্যানার্জির পশ্চিমবঙ্গের মতো নয়। সেখানকার হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে জাতপাতে বিভক্ত হলেও তাঁরা সামগ্রিকভাবে রামভক্তির জোয়ারে ভাসেন।

সম্ভবত ২০২৩ সালের মধ্যে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির নির্মাণ হয়ে যেতে পারে। ২০২৪-এর গোড়ার দিকে যদি তার উন্মোচন হয়ে যায় তাহলে কেবল উত্তরপ্রদেশ নয়, সমগ্র উত্তর ভারত-সহ গোটা ভারতে হিন্দু ভাবাবেগ যে কোনদিকে যেতে পারে তা কারো অজানা নয়। বিজেপি যে সে চেষ্টা করবে না এমন মনে করার কোনো ভিত্তি নেই। সেক্ষেত্রে হিন্দু ভোট একচেটিয়া ভাবে যে বিজেপির ঝুলিতে পড়বে এটা প্রায় নিশ্চিত। আর অন্যরা ফের রামমন্দির নিয়ে প্রশ্ন তুললে তার পরিণতি সম্পর্কেও সবাই অবগত। উত্তরপ্রদেশ-সহ সারা ভারতে কোথাও মুসলমান ভোটারদের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের মতো নয়। কোথাও কোথাও মাত্র ৫-৬ শতাংশের মতো। দিদি যদি দেশের বড়ো বড়ো রাজ্যকে তাঁর পশ্চিমবঙ্গের মতো বাংলাদেশ থেকে আগত বেআইনি ভোটারদের ঘাঁটি বলে মনে করে থাকেন তবে সে ভুল ভাঙতে দেরি লাগবে বলে মনে হয় না। অন্য সব রাজ্যে মুসলমান ভোটের মেরুকরণের চেষ্টা হলে কিংবা তৃণমূলকর্মী শেখ আলমের মতো '৩০ শতাংশ মুসলমান জোটবদ্ধ হলে চার-চারটে পাকিস্তান হতে পারে' জাতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশদ্রোহিতামূলক হুমকিকে হিন্দু-মুসলমান কেউ-ই বরদাস্ত করবে না। প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শ মোতাবেক 'বাংলা নিজের মেয়েকে চায়' স্লোগান তো আর কোথাও চলবে না।

মনে রাখতে হবে, মোদী তথা অমিত শাহর মতো বিজেপি নেতারা মোটেই কাঁচা খেলোয়াড় নন। ২০২১-এ স্বাধীনতার ৭৫ বছরের দিন মোদী লালকেল্লা থেকে প্রতিবছর ১৪ আগস্ট দেশ ভাগ করে পাকিস্তান বানানো এবং মুসলিম লিগের বীভৎস সাম্প্রদায়িক আচরণের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য 'বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস' পালন করার কথা ঘোষণা করে ২০২৪-এ কী 'খেলা হবে' তার বল ছুঁড়ে দিয়েছেন। এখনো বিজেপির হাতে তাদের দীর্ঘদিনের একটা অত্যন্ত ধারালো অস্ত্র মজুত রয়েছে। সে অস্ত্র হলো সারাদেশে 'এক দেওয়ানি বিধি' প্রণয়ন। এটা যাকে বলে দুদিকে ধারালো তলোয়ার। সমর্থন করলে বিজেপি বিরোধীদের মৌলবাদী পুরুষদের সমর্থন হাতছাড়া হতে পারে, মুসলমান মহিলাদের ভোটও চলে যেতে পারে বিজেপির দিকে। তাঁরা 'চুপচাপ কমল ছাপ' দিতে পারেন। আবার সমর্থন না করলে হিন্দু ভোট পুরোটাই বিজেপি-বিরোধীদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। দিদি, বিজেপিও কিন্তু 'খেলা' করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে! বলা বাহুল্য, বিলুপ্তির পথে যেতে বসা ছোটো ছোটো আঞ্চলিক দলের কাছে ভোটের বাজারে সফল একটা দলনেত্রীর আঁচলের তলায় আশ্রয় নেওয়ার যে প্রয়োজন আছে, জাতীয় স্তরের বা বড়ো বড়ো আঞ্চলিক দলগুলোর তা কিন্তু নেই। এত সমস্ত 'যদি' এবং 'কিন্তু' পার করে কেবল বিজেপি ঠেকানোর খেলায় দিদি 'দাদা' হতে পারবেন কি? লাখ নয়, কোটি টাকার প্রশ্ন। ভাইপোর হাতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিল্লি দখলের পথ ধরলে মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক পরিণতি কিন্তু মুলায়ম সিংহ যাদবের মতো হতে পারে।

(চলবে)

পুরাণ ও হিন্দুত্বে এখনও মজে বাংলা বিনোদন

জিৎ সরকার

গোটা দেশে সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলা ধারাবাহিকের নাম বলতে পারেন? অনেকেরই জানা নেই নামটা, 'সাধক বামাক্ষেপা', ইটিভিতে সম্প্রচারিত তারাপীঠের বামদেবকে নিয়ে ২০০৯ সালে শুরু হয় এই ধারাবাহিক, টুটু সিনহার পরিচালনায়। শেষ হয় ২০১৮ সাল নাগাদ, ২৯৮৮টি পর্বে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োতে এর শুটিং যে ফ্লোরে হয়েছিল সেইখানে তারাপীঠের তারা মায়ের মন্দির ও মূর্তি তৈরি করা হয়। সেটা ওই ফ্লোরে আজও বিদ্যমান। ওই ফ্লোরে করুণাময়ী রানি রাসমণির শুটিং হয় সেটাও জি বাংলায় দারুণ জনপ্রিয়। বামাচরণের চরিত্রে অভিনয় করা গায়ক নায়ক সুদর্শন অরিন্দম গাঙ্গুলি বলেন, ওই ধারাবাহিক বাঙ্গলার দর্শকমনকে অনেকাংশেই উসকে দিয়েছিল সনাতন ধর্মে। মনে রাখতে হবে ওই সময় বাঙ্গলার কমিউনিস্ট শাসনের অন্তিম সময় হলেও রমরমিয়ে হিট ছিল ইটিভি বাংলায়, 'সাধক বামাক্ষেপা'। এই নিয়েই অরিন্দমবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

বামাক্ষ্যাপা ধারাবাহিকে অরিন্দম গাঙ্গুলি

—সাধক বামাক্ষেপা সিরিয়ালের জনপ্রিয়তার কারণ কী?

—আসলে ভারতের জমিটাই অধ্যাত্মভূমি, বাঙ্গলায় আধ্যাত্মিক মনীষীরা তো স্বর্গরাজ্য গড়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মা সারদা, শ্রীচৈতন্য, প্রর্ণবানন্দজী...

—আপনি তো দূরদর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন।

—সেটাও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ২৫০ পর্ব করেছিলাম...

সেকুলাররা বলে থাকেন, 'বাঙ্গালি ধর্মেও আছে জিরাফেও আছে'... ধর্ম তো হলো, জিরাফ কী? নিছক এক লম্বা গলার প্রাণী! যে কিনা সেকুলার (পড়ুন সংখ্যালঘুপ্রেমী), উঁচু গাছের পাতা খায়, মার্কস-লেনিন চেবায়, উন্নাসিক, কাস্ত্রো-গোদার-মাও ভক্ত। সময়টা ২০২১, সামনেই পুজো, বছর দেড়েক লাগাতার ঘরবন্দি মানুষ। তাতেই বেরিয়ে এসেছে আর এক সত্য। সাধারণ বাঙ্গালির মন পসন্দ ধারাবাহিক, সব বয়সী নারী ও পুরুষ, উচ্চবিত্ত থেকে বস্তিবাসী, এক সুতোয় গাঁথা। সূত্র টেলিভিশন টি আর পি (টার্গেট রেটিং পয়েন্ট) দুই শীর্ষ চ্যানেলে চলছে সামাজিক ধারাবাহিকের সঙ্গে রীতিমতো টক্কর দিয়ে বেশ কিছু ভক্তিমূলক ধারাবাহিক। স্টার জলসায় 'রাধাকৃষ্ণ', 'শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মীরা', 'মহাপীঠ তারাপীঠ' অন্যদিকে জি বাংলায় 'জয় হনুমান', 'করুণাময়ী রানি রাসমণি', 'মঙ্গলময়ী সন্তোষীমা... ইত্যাদি। সান বাংলায় নাগ দেবতার লাগাতার গল্প। কালার্স বাংলাও তাই। ...রানি রাসমণির চরিত্রে দিতিপ্রিয়া এখন তারকা। এই রানি রাসমণিকে নিয়েই ৯০-এর দশকে দেবাংশু সেনগুপ্তর পরিচালনায় 'রাজেশ্বরী' দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল দূরদর্শনের পর্দায়। 'মহাপ্রভু' ধারাবাহিকে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে যীশু সেনগুপ্ত অভিনয় করেছিলেন। আজ তিনি বাঙ্গলার তারকা অভিনেতা। হিন্দিতে মহাভারতের দ্রৌপদীকে নিয়ে বাংলায় ধারাবাহিকেও সফল সম্প্রচার হয় নব্বইয়ের দশকেই। নাম ভূমিকায় রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, ইনিও আজ সাংসদ-তারকা। ইটিভির জন্মলগ্নে মেগা ধারাবাহিক 'মা মনসা' ছিল জনপ্রিয় ধারাবাহিক। যেখানে প্রথমবার চোখ ধাঁধানো সেট সেটিং ছিল। যেটা বাংলায় দেখানো হলেও শুটিং হয়েছিল হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে। পরেও মা মনসা স্টার জলসায় নতুন করে এসেছে। 'দুর্গা'-ও ছিল আধ্যাত্মিক পটভূমিকায় বর্তমান সময়ের ধারাবাহিক।

টেলিভিশনের দর্শকের একটি অংশ বয়স্ক নাগরিক। নিত্যনতুন রিসার্চের ভিত্তিতে তৈরি ধারাবাহিকে নবীন প্রজন্মকে ধরে রাখার দায়িত্ব পেশাদার নির্মাতারা সামলেছেন নানা উপকথা তৈরি করে, কারণ টিআরপি বড়ো বালাই। এর ওপর বিজ্ঞাপন আসবে। ৮০ ও নব্বইয়ের দশকে বাঙ্গালি দর্শক যখন হলমুখী ছিল তখন 'জয় বাবা তারকনাথ', 'জয় বাবা লোকনাথ' ইত্যাদি কিছু ছবি তৈরি হয়েছিল বইকি। তাদের গান মুখে মুখে আজও ফেরে। সেই সময় নামকরা বাম পরিচালকরা পাশাপাশি পুরোনো সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি নিয়ে 'সতী', 'অন্তর্জলি যাত্রা' নির্মাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন। পুরস্কার প্রাপ্তিও হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২-র বাঙ্গলায় ভয়াবহ হিন্দুনিধন নিয়ে দক্ষিণের অভিনেতা-পরিচালক কমল হাসান— 'হে রাম' ছবি তৈরি করেছিলেন। তথাকথিত বামপন্থী নির্মাতারা আজও এ ব্যাপারে উদাসীন। তাঁদের ছবিতে হিন্দুধর্ম মানে মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, ছুঁৎমার্গ, ভণ্ডামী।

রানি রাসমণি ধারাবাহিকে দিতিপ্রিয়া রায় ও সৌরভ সাহা

দেশপ্রেম নিয়ে যখন তামিল, হিন্দি ছবি একের পর এক জনপ্রিয় হচ্ছে তখন বাংলায় গল্পের ভাবনার দীনতায় টেলি ফিল্ম মার্কা প্রেক্ষাপট নিয়ে একের পর এক ছবি নির্মিত হচ্ছে। লক্ষ্য, পুরস্কার প্রাপ্তি। দর্শক দেখল কিনা (হলে বসে) তাতে কিছু যায় আসে না। এই বাঙ্গালি দর্শকই 'উরি', 'বেবি', '১৬ ডিসেম্বর', অতীতে 'বর্ডার', 'কসম হিন্দুস্থান কি', 'গদর'-এর মতো ফিল্ম ব্ল্যাকে টিকিট কেটে দেখেছে। অথচ আমাদেরও রয়েছে বাংলাদেশের জ্বলন্ত সীমান্ত সমস্যা, অনুপ্রবেশ, নারী পাচার, শিশু পাচার, গোরু পাচারের মতো নিয়মিত ঘটনা। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরে অত্যাচারের বাস্তব কিন্তু অনুচ্চারিত ঘটনা। সেদিকে অন্ধ সেকুলার নির্মাতারা। ▮

সত্যনিষ্ঠ মানুষ

বহুকাল আগে বারাণসীর একটি গ্রামে ধর্মপাল বংশ কোনও একসময় বাস করত। বেশ কিছুকাল পরে সেই বংশের নামানুসারে সেই গ্রামের নাম হয় ধর্মপাল গ্রাম। ধর্মপাল বংশের সকলেই সত্যনিষ্ঠ ও সদাচারী। এই বংশের কাজের লোকেরাও কখনও মিথ্যাকথা বলে না। তাই ওই বংশের সুনাম চারিদিকে। বোধিসত্ত্ব

একবার ওই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম ছিল ধর্মপাল কুমার।

ধর্মপাল কুমার বড়ো হলে শিক্ষালাভের জন্য গুরুগৃহ পাঠানো হলো। ধর্মপাল কুমার ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সৎ। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। গুরুদেব ধর্মপাল কুমারের জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন।

এরমধ্যেই হঠাৎ একদিন গুরুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালে জীবনদীপ নির্বাপিত হলো। পুত্রকে দাহ করার জন্য শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। গুরুদেবের পুত্রের অকালমৃত্যুতে সবাই শোকাকুল। শুধু ধর্মপাল কুমার নির্বিকার। তাঁর চোখে জল নেই। দাহ শেষ করে ফেরার পথে শিষ্যরা বলতে লাগল, সত্যি খুব অল্প বয়সে চলে গেল গুরুদেবের পুত্র। অন্য একজন বলে উঠল— কী আর করা যাবে, সবই বিধির বিধান, জন্ম-মৃত্যু ভগবানের হাতে। ধর্মপাল কুমার বললেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, এত অল্প বয়সে মানুষের মৃত্যু হয় কী করে? একমাত্র বার্ধক্যই মানুষকে মৃত্যুদান করে। গুরুদেবের আর এক শিষ্য বলল— তোমাদের পরিবারে কি কেউ অল্প বয়সে মারা যায়নি? ধর্মপাল কুমার বললেন, পরিবার তো দূরের কথা, আমাদের বংশের ইতিহাসে অকালমৃত্যু কারো হয়নি।

গুরুদেব শিষ্যদের কাছ থেকে ধর্মপাল কুমারের পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘজীবনের কথা জানতে পারলেন। ধর্মপাল কুমারকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করতেই ধর্মপাল কুমার বললেন, আমাদের পরিবারের সবাই সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ। সবাই সৎভাবে জীবনযাপন করেন, তাই অকালমৃত্যু আমাদের বংশের কাউকে গ্রাস করে না। গুরুদেব ধর্মপাল কুমারের কথা শুনে খুব খুশি হলেন। তাকে বললেন, এবার থেকে আমি চলব তোমাদের ধর্মের পথে।

কিছুকাল পরে গুরুদেব ধর্মপাল কুমারকে ডেকে বললেন, আমি কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি, গুরুকুলের ভার রইল তোমার উপর। ধর্মপাল কুমার বললেন, চিন্তা করবেন না গুরুদেব, আপনার আশীর্বাদে আমি গুরুকুলের দায়িত্ব ঠিক চালিয়ে নিতে পারব।

গুরুদেব আশ্রম থেকে যাবার সময় একটি মরা ছাগলের হাড়গোড় পুঁটলিতে বেঁধে নিলেন। চলতে চলতে তিনি হাজির হলেন ধর্মপাল গ্রামের ধর্মপাল কুমারের বাড়িতে। পুত্রের গুরুদেব এসেছেন, তাই ধর্মপাল কুমারের বাড়ির লোকেরা গুরুদেবের সেবায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। গুরুদেবের জন্য কেউ জল নিয়ে এল, কেউ-বা পাখার বাতাস করতে লাগল। তারপর পবিত্র আসনে বসিয়ে গুরুদেবকে ভোজন করাল। খাওয়া হলে বাড়ির সবাইকে ডেকে গুরুদেব করুণ মুখে বললেন, কী যে হলো! ধর্মপাল কুমার খুবই মেধাবী ও নিষ্ঠাবান ছিল। হঠাৎ কী এক মারণব্যাধি তার জীবনদীপ নিভিয়ে দিল যে আমি কিছুই করতে পারলাম না।

গুরুদেবের কথা শুনে ধর্মপাল কুমারের বাবা হাসিতে ফেটে পড়লেন। গুরুদেবকে তিনি বললেন, এ কখনও সম্ভব হতে পারে না। আমাদের বংশে একশো বছরের কম কেউ বাঁচে না। আমার পুত্রের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে না। অবাক দৃষ্টিতে গুরুদেব ধর্মপাল কুমারের বাবার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর তিনি পুঁটলিটা খুলে হাড়গোড় দেখিয়ে বললেন, দেখুন, এগুলি আপনার পুত্রের হাড়গোড়। ধর্মপাল কুমারের বাবা বললেন, এগুলি কোনও ছাগল বা মৃত পশুর হাড়গোড় হবে। এগুলি আমার সন্তনের হতে পারে না।

গুরুদেব ধর্মপাল কুমারের বাবার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হলেন। তারপর সব ঘটনা খুলে বললেন। এরপর তিনি বললেন, এতদিন আমি ছিলাম ধর্মপাল কুমারের গুরুদেব। এরপর থেকে আমি আপনাদের কথামতো চলব। এবার থেকে আপনারাই হবেন আমার গুরুদেব। সত্যি, আপনাদের মতো সত্যনিষ্ঠ বংশ খুবই দুর্লভ।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের বিপ্লবী

কানাইলাল দত্ত

কানাইলাল দত্ত অগ্নিযুগের বিপ্লবী ছিলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ভিতরে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হওয়া নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে হত্যা করার অপরাধে ১৯০৮ সালের ১০ নভেম্বর তাঁর ফাঁসি হয়। চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নেন। চন্দননগরে নিজের চেষ্টায় তিনি অনেকগুলি বিপ্লবী সমিতি গড়ে তোলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯০৮ সালে হুগলীর মহসীন কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও ইংরেজ সরকার তাঁকে ডিগ্রি প্রদান করতে বাধা দেয়, কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই বাধা উপেক্ষা করে তাঁকে ডিগ্রি প্রদান করে।

জানো কি?

- লাক্ষাদ্বীপের রাজধানীর নাম কাভারাত্তি।
- লেখার চক আসলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।
- ভারতীয় রেলের ম্যাসকট হলো 'ভোলু ট্যু গার্ড।'
- ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট।
- আন্তর্জাতিক বিচারলয়ে প্রথম ভারতীয় বিচারক মহারাজা নগেন্দ্র সিংহ।
- কোনারকের সূর্যমন্দিরকে 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' বলা হয়।
- গঙ্গনদী বাংলাদেশে 'পদ্মা' নামে পরিচিত।

ভালো কথা

সত্যিকারের শিক্ষক

পাঁচ সেপ্টেম্বর আমরা বাড়িতেই শিক্ষক দিবসের আয়োজন করেছিলাম। তাতে আমরা আমাদের গৃহশিক্ষক সুজয় স্যারকে ডেকেছিলাম। আমারা মা-বাবা, কাকু-কাকিমা ও জেঠু- জেঠিমাকেও ডেকেছিলাম। আমাদের পড়ার ঘরে ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ছবিতে প্রথমে সুজয় স্যার মালা পরালেন। তারপর আমরা সবাই একে একে ফুল দিয়ে প্রণাম করলাম। আমি স্যারকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি আমাকে ধরে ফেলে বললেন, আজ শিক্ষক দিবস। ড. রাধাকৃষ্ণন সমস্ত শিক্ষকের উদ্দেশে দিনটি উৎসর্গ করতে বলেছেন। মানুষের প্রথম শিক্ষক হলেন তার মা। তাই তোমরা সবাই আগে মাকে প্রণাম কর। আমরা সবাই নিজের নিজের মাকে প্রণাম করে স্যারকে প্রণাম করলাম। তারপর অন্য গুরুজনদের প্রণাম করলাম। স্যারের কথা শুনে মা- কাকিমা-জেঠিমার চোখে জল এসেছিল। মা স্যারকে বললেন, আপনি সত্যিকারের শিক্ষক।

স্নেহাংশু বর্মণ, একাদশশ্রেণী, জামালদহ, কোচহিার।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ভাদ্র

সঞ্চিতা পাল, একাদশশ্রেণী, মঙ্গলবাড়ি, মালদা।

ভাদ্রের রোদে তাল পাকে
ভাদ্রের রোদে মাথা ফাটে।
ভাদ্রের রোদে জীবাণু মরে
ভাদ্রের রোদে ফসল বাড়ে।

ভাদ্রের আকাশ কাশ ফোটায়
ভাদ্রের ভোর শিউলি ঝরায়।
ভাদ্রের রাতে শিশির পড়ে
ভাদ্রের হিমে নাকও ঝরে।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

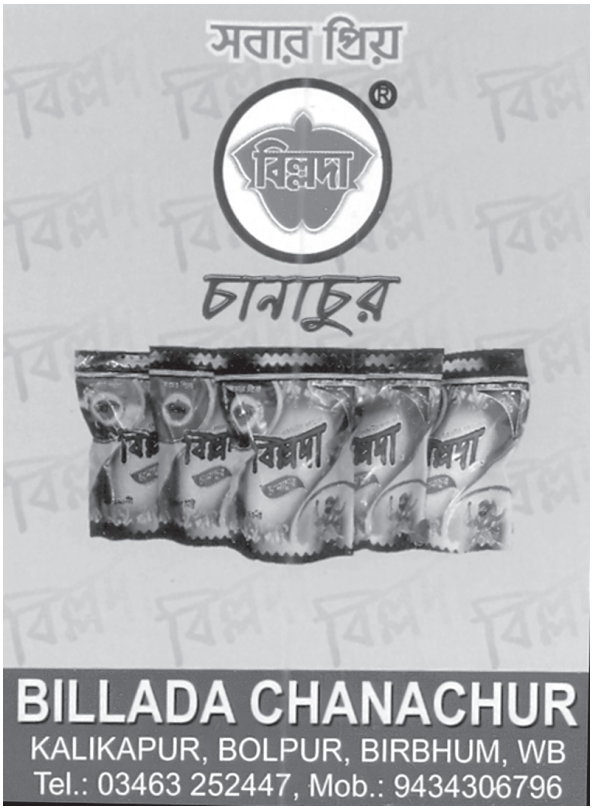

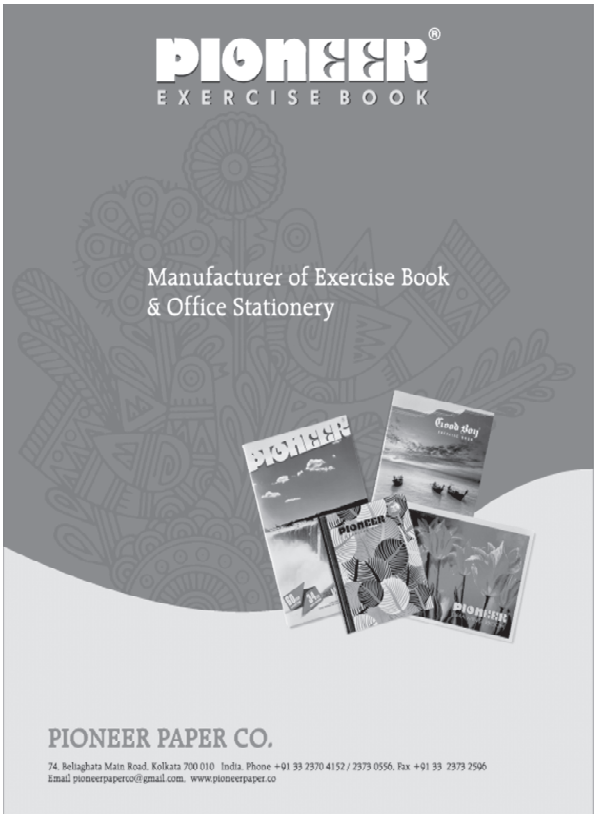

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

ধর্মীয় আধিপত্যের ভাবনা দেশকে দুর্বল করে

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

ভারতে একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করা কতিপয় বুদ্ধিজীবী 'হিন্দুত্ব'কে ধর্মের মোড়কে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কারণ তাঁরা জানেন, এর ফলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সমালোচনা করা সহজ হবে এবং সঙ্ঘকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখে তার মহান উদ্দেশ্যকে প্রতিহত করা যাবে। তাই এই কুৎসা ও অপপ্রচারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সঠিক ব্যাখ্যাটি জনসমক্ষে তুলে ধরা একান্ত জরুরি। 'হিন্দুত্ব' একটি রাষ্ট্রবোধক ভাবনা। 'হিন্দুত্ব' ও 'ভারতীয়ত্ব' পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতীয় সভ্যতা হাজার হাজার বছরের পুরনো। ভরত মুনির 'অসুর বিজয়' গ্রন্থটির আনুমানিক রচনাকাল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। এছাড়াও আরও কিছু গ্রন্থ ও পুথির অস্তিত্ব মিলেছে। যেগুলি ততধিক পুরনো। তাই হাজার হাজার বছর পূর্বে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার অস্তিত্ব ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতার নিদর্শন। এই প্রাচীন ভারতীয় ভূখণ্ডে সহস্রাধিক বছর কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাসকারী প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হিন্দু, তাঁর উপাসনা পদ্ধতি যাই হোক। এই শর্ত মেনে নিলে ভারতে বসবাসকারী সনাতনী, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন-সহ সবাই হিন্দু। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন হিন্দুত্বের পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। হিন্দুত্ব জাতিগত সত্তার ওপর আধারিত একটি রাষ্ট্রীয় ভাবনা।

যেহেতু ভারত কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়, তাই ধর্মীয় আধিপত্যবাদ এদেশে চলে না। একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করে সেই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমগ্র জাতির একাত্মতা। ভারতে জাতি গঠনে যাঁরা লাগাতার প্রয়াস করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন সঙ্ঘের বর্তমান সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহন রাও ভাগবত। তিনি একাধিক বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে ধর্মীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী ও

জাতিগত ঐক্যের ভিত্তিতে শক্তিশালী ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

সামাজিক বৈষম্য জাতির বুনিয়াদকে দুর্বল করে। অতীতে জাতিগত অনৈক্যের কারণে দেশ বারবার বিদেশি হানাদারদের দ্বারা পরাধীন হয়েছে। মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত ইসলামি অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা এবং তার পরবর্তীক্ষেত্রে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটিশ ও ফরাসিদের দ্বারা। তাই ধর্মবিশ্বাস ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিই পারে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করে দেশকে শক্তিশালী করতে। সম্প্রতি ভাগবতজী মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চের একটি অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংস্কৃতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, যে হিন্দু একজন মুসলমানকে শারীরিকভাবে আঘাত করেন, তিনি হিন্দু নন। ভারতে বসবাসকারী সবধর্মের মানুষের একে অপরকে আলাদা ভাবা অভিপ্রেত নয়। কারণ, ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয়ের ডিএনএ এক। অর্থাৎ তাঁদের সম্পর্কও ভ্রাতৃপ্রতীম। ভারতে কিছু ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাবিদ ও কিছু রাজনৈতিক দলের নেতা রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগান ও তারপরে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য' তত্ত্বের অবতারণা করেন। সরসঙ্ঘচালকজী এই ভাবনারও সমালোচনা করেন। তাঁর মতে, হিন্দু-মুসলমানের ডিএনএ যখন এক, যখন তাঁরা একই রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত, একই সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গ, তখন তাঁদের মধ্যে ঐক্যও সহজাত এবং অতি স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। আসলে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য'— এই তত্ত্ব ও ধারণা যাঁরা সুকৌশলে সমাজের মধ্যে চালিত করেন, তাঁদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই থাকে সমাজে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ঘটিয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করা এবং আঞ্চলিক ও বহুমাত্রিক ধর্মীয় আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রকে দুর্বল করা।

সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মীয় আধিপত্যবাদ যে কত ভয়ংকর হতে পারে আফগানিস্তান তা চোখে আঙুল দিয়ে বিশ্বকে দেখিয়েছে। একটি ধর্মীয় জঙ্গি গোষ্ঠীর ক্ষমতাদখল, সেই দেশের নাগরিকদেরই বিপন্ন করে তুলেছে এবং তাঁদের বিপন্নতা এতটাই যে, মরিয়া হয়ে তাঁরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। আসলে পশ্চিম এশিয়ার জিহাদি শক্তির স্বরূপ এটাই। অপ্রিয় হলেও সত্যি, এই জিহাদিদের পূর্বপুরুষরা এককালে ভারতে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করেছিল ও ভারতেও জিহাদি কার্যকলাপ শুরু করেছিল। বিগত কয়েকশো বছরেও যে ওই জিহাদিদের চরিত্র এতটুকুও বদলায়নি সাম্প্রতিক আফগানিস্তান তার প্রমাণ। কিন্তু আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীদের বলব, সঙ্ঘের সমালোচনা করছেন, করুন কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে আপোশ করে জিহাদি শক্তিকে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ করুন। আর দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে অনুরোধ, আপনার যা ধর্মবিশ্বাস, আপনি সযত্নে তা পালন করুন, আপনার যা রাজনৈতিক মত, সযত্নে তা রক্ষা করুন। কিন্তু হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বকে রক্ষার স্বার্থে, রাষ্ট্রের স্বার্থে, হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বকে রক্ষার জন্য দল-মত-ধর্মবিশ্বাস, ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন— এটাই সময়ের দাবি। □

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের উৎস সন্ধানে

ড. অশোক কুমার দাস

ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় মহান কবি কালিদাস ভূমণ্ডলে আবির্ভূত হয়ে কাব্যের অমৃতধারায় প্রাণের উন্মাদনা জাগিয়েছেন। রামায়ণ, মহভারত, পুরাণ, হিতোপদেশ ছাড়া ভাবের সমুদ্রে ডুবে যাওয়ার রস না থাকায় সুনিপুণ কৌশলে দৃশ্যকাব্যের অবতারণায় গানের মাধুর্যে, অপূর্ব অভিনয়ের নৈপুণ্যে তিনি

বাল্মীকি ও বেদব্যাসকে পিছনে ফেলে দর্শকদের হৃদয় মন জয় করে নিয়েছেন। মহান রাজা রঘুর শেষ বংশধররা বহু ধারায় বিভক্ত হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে ধ্বংস হয়ে যান। তাই ভারতবর্ষে শত শত বছর ধরে চলতে থাকে অরাজকতা। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য বলবিক্রমে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলি জয় করে সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। তাঁরই সভায় নবরত্নের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্ণসিংহাসনে আরোহন করেছিলেন মহাকবি কালিদাস। চারশো বারো খ্রিস্টাব্দ থেকে ষাট খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সম্রাট কুমার গুপ্তকে রাজ্য পরিচালনার সুপরামর্শ দিয়ে শিল্পে বাণিজ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানে, ধর্ম ও দর্শনে সুবর্ণযুগের সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা বিশ্বের কোনো কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু মহাকবির জীবন কাহিনি আজও আমাদের কাছে গূঢ় রহস্যাবৃত থেকে গেছে। তাঁর অমর আত্মার-বাণী আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয়, যেন শুনতে পাই --- 'আমি স্বর্গলোক থেকে বলছি কালিদাস'।

'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বিশ্বজননী ভারতবর্ষ!' তোমার শ্রীচরণ বন্দনারত তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্র। চিরউন্নত মাথায় মুকুট গিরিহিমালয়। মহাদেবের জটা হতে প্রবাহিত গঙ্গার অমৃত ধারায় শতকোটি সন্তান আজ লালিত পালিত। যেমন তুমি মা বক্ষে ধারণ করেছ স্বর্গের দেবতাদের তেমনই অসুরদের তাণ্ডব লীলায় দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে বার বার। তোমার অঙ্গচ্ছেদনে আমি মর্মাহত। জন্মলগ্ন তিনশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দ থেকে চরণযুগল আরাধনায় আজও আমি ব্রতী। এই অধম মূর্খ সন্তানের লহ প্রমাণ। মা! তোমার কাছে আমার আত্মপরিচয় কেন গোপন করেছিলাম তা যদি শুনতে চাও বলছি শোন তবে—

ভারতবর্ষের জনকপুর জেলাটি এখন দু'ভাগে বিভক্ত। এক অংশ চলে গেছে নেপাল রাজ্যে, আর এক অংশ রয়েছে ভারতবর্ষে। বিহার রাজ্যে দ্বারভাঙ্গা থেকে পনেরো-কুড়ি কিলোমিটার উত্তরে গৌতম মুনির আশ্রম। ওখান থেকে প্রায় পঁচিশ তিরিশ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিম কোনে মধুবনী জেলায় উচ্চপীঠ গ্রাম। গৌতম মুনির আশ্রম, মহীয়সী সীতার আশ্রম এবং ঋষি জনকের আশ্রম ছিল আমার শৈশবের লীলাভূমি। বর্তমান মধুবনী জেলায় উচ্চপীঠ গ্রামের প্রাচীনকালের ভগ্নাবশেষ কালীমন্দিরটি এখনও রয়েছে। এই কালীমায়ের মন্দিরটি এখন ভগবতী মন্দির নামে খ্যাত। এখানেই অতি দরিদ্র সৎ ব্রাহ্মণকুলেই আমার জন্ম। বাল্যকালে পণ্ডিতরা নাম রেখেছিলেন জগন্নাথ। গুরুজনেরা আদর করে ডাকতেন কালো।

উচ্চপীঠ থেকে প্রায় ছ' সাত কিলোমিটার উত্তরে বর্তমান দামোদরপুর গ্রামের প্রাচীন মনোরম সরোবরটি এখনও রয়েছে। রাজা মহাদেবরাজের দুই রানি। তাই এই সরোবরের নামকরণ হয়েছে দুয়োরানি সরোবর। এই সরোবরের সলিলের এখন আয়তন দুইশত একর। এই সরোবরটি ছিল আমার যৌবনের উপবন, আর মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী ছিল আমার বার্ধক্যের বারণসী। প্রাচীনকাল থেকে এখনও এই সরোবরে প্রভাত সূর্যকিরণ স্পর্শে বিকশিত পদ্মের সৌন্দর্যে চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়। সরোবরের উত্তর-পূর্ব কোনে প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় এখনো মহাদেবের মন্দিরটি সাক্ষ্য বহন করে চলেছে— যেখানে বসে আমি পুজো করতাম, কাব্যগ্রন্থ ও নাটকগুলি লিখতাম। এই সরোবরের উত্তর পশ্চিম কোনে প্রাচীনকালের কালীমন্দিরটি এখনো রয়েছে। প্রাচীনকালে কালীমন্দির প্রাঙ্গণেই ছিল অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিত রাজা মহাদেবরাজের রাজপুরি। এই রাজপুরীর উত্তর পাশে কুলু কুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত হতো গঙ্গার শাখা নদী কমলা। বর্তমান নদীটি ক্ষীণ হয়ে গেছে। সুমহান রাজা ছিলেন ঋষি জনকের বংশধর। প্রজাদের মঙ্গল সাধন ছিল তাঁর ব্রত। ধন সম্পদের অর্ধাংশ ব্যয় করতেন সাধু সজ্জনদের সেবায়। সুমহান রাজা সুকৌশলে প্রবল পরাক্রান্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে

পারস্পরিক শুভেচ্ছায় ও সহযোগিতায় বন্ধুত্ব অটুট রেখেছিলেন। তাঁরই দ্বিতীয়া পত্নীর একমাত্র বিদুষীকন্যাই ছিল বিদ্যোত্তমা বা বিদ্যাবতী। রূপেগুণে অতুলনীয়া কন্যার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দেশ-দেশান্তরে। বিশ্ব বিধাতা যেন সমস্ত রূপগুণ দিয়েই তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর চলন ছিল যেন নৃত্য। মধুময় কথাগুলি যেন সংগীতের সুর। যাঁরা এই অপরূপা কন্যার দিকে একবার তাকাতেন, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে ভাবতেন— 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কেকার অলংকার, কে জানে তার এ রূপ দিল এ কোনো মণিকার'।

আদরের কন্যার জন্য মহাদেবরাজ স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। মধুবনী উচ্চপীঠ নগরীর পণ্ডিত ত্রিলোচনের পরামর্শে তিন পণ্ডিতের চক্রান্তে মহামূর্খের গলায় রাজকন্যা বরমাল্যটি পরিয়ে দেওয়ায় ঘটে গেল এক অঘটন। পরমুহূর্তে আমার মূর্খতা জানতে পেরে, রাজকন্যা লাথি মেরে তাড়িয়ে দেন রাজপুরী থেকে। মহাদেবরাজ ক্রোধান্ধ হয়ে উচ্চপীঠ নগরীটিকে ধ্বংস করে দেন। আমার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে দেশদেশান্তরে। হঠাৎ স্বামীর এই মৃত্যুসংবাদে শোকতপ্তা রাজকন্যা বিধবা নারীর ন্যায় জীবনযাপন করতে লাগলেন।

পরদিন প্রভাতে বিবাহের অমূল্য রত্নরাজি ফেলে দিয়ে অতি দরিদ্র ভিক্ষুকের বেশে আত্মগোপন করে আশ্রয় নিলাম পণ্ডিত দামোদরের গুরুকুল আশ্রমে। এই গুরুকুল আশ্রমটি ছিল সরোবরের উত্তর পূর্ব কোনে দুই তিন কিলোমিটার দূরে। এই গুরুকুল আশ্রমটি ছিল রাজা মহাদেব রাজের পুত্রবৎ এবং গুরুদেব ছিলেন রাজার পিতৃতুল্য। প্রথমে এই আশ্রমে পুজোপার্বণ, রান্নাবান্না, ঠাকুরের ফুলতোলা, ছাত্রদের বাড়ি থেকে সিদে আনা, পরে গুরুদেবের কাছে বিদ্যাভ্যাসের সুযোগ পেলাম। বছর দশেক পরে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলাম আশ্রমের পূজক হিসাবে। এই আশ্রমের বর্ণনা দিয়েছি শকুন্তলা নাটকে যেমন আছে কণ্বমুনির আশ্রমের বর্ণনা। এই আশ্রমে কোনো কোনো সময়ে রাজা-রানিমা আসতেন, কোনো কোনো সময়ে বিদ্যাবতী আসতো, সঙ্গে থাকত দু'জন সহচরী। জায়গাগুলি ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। শাল, সেগুন, মহুয়া, শিশু আর বিশাল বিশাল আম্রকানন। রাজবাড়িটি ছিল অপূর্ব মনোরম— যেন নন্দনকানন। রামায়ণে যেমন হনুমান ছদ্মবেশে মন্দোদরীর কাছ থেকে এনেছিল রাবণের মৃত্যুবান— ঠিক সেইরূপ ছদ্মবেশে ব্রাহ্মণ ঠাকুর সেজে বহুবার গেছি রাজবাড়ির সম্মুখে কালীমন্দিরে পুজো করতে। গুরুদেবের বক্তব্য জানাতে বহু সময় গেছি রাজার কাছে। এই রাজবাড়িতে একটি নাটক গোষ্ঠী ছিল। দুর্গাপূজার পর বিপুল সমারোহে এখানে চলত নাট্যানুষ্ঠান। আমার প্রথম লেখা--- 'কুমারসম্ভব' কাব্যটি নাট্যাকারে এখানে অভিনীত হয়। এই কাব্যটিতে মহাদেবের ভূমিকায় অভিনয় করি। নিবেদন করি রাজা ও রানিমাকে। আমার বিবাহিত জীবনের কিছু দৃশ্য তুলে ধরি কাব্যনাটকটির মধ্যে— যেটি আমার স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিদ্যাবতীকে বিয়ের পিঁড়িতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে সুন্দর একটি শাড়ি পরানো হলো— যেন ফুলের বনে রঙিন প্রজাপতি। অপূর্ব রূপলাবণ্যের আভায় সকলের চোখ ঝলসিয়ে উঠল। বিদ্যাবতীকে বসানো হলো পূর্বমুখে প্রসাধন বেদীতে। পুষ্পের পরাগ রেণু অগুরু-চন্দন-চুয়া সর্বশরীরে প্রলেপ দেওয়ায় আরক্তিম আভায় আরও সুসজ্জিত হয়ে উঠল। একজন পুরনারী বকুল-জুঁই-পদ্ম ফুলের দ্বারা কেশ বিন্যাসে সজ্জিত করল। চরণ যুগল রঞ্জিত করল অলক্ত রাগে— যেন পদ্মের পাঁপড়ির মতো শোভা পেতে লাগল। তখন একজন সখী উপহাস করে বলেছিল— তোমার পতির মস্তকে একবার চরণ যুগল স্পর্শকর ভাই। বিদ্যাবতী হাস্যমুখে হাতের মালাখানি দিয়ে আঘাত করল সখীকে। সখীরা নয়নের শোভার জন্য টেনে দিল কাজলের রেখা। সাজসজ্জা শেষে মুখশ্রী দেখবার জন্য গিয়ে দাঁড়াল আয়নার সামনে। বিদ্যাবতীর মায়ের অশ্রু নেমে এল বন্যার মতো। চোখের অশ্রু মুছে কন্যার বিবাহের মাঙ্গলিক-সূত্রটি বেঁধে দিল হাতে। কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে গুরু স্থানীয়া রমণীদেরকে প্রণাম করালেন। পূর্বের ঘটনাটাটা তুলে ধরলাম কাব্যনাটকটিতে বিদ্যাবতীর সামনে। যেন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জেগে উঠল পূর্ব স্মৃতি। যা ঘটেছিল তাঁর জীবনে।

সখীদের ঠাট্টা বাস্তবে পরিণত হলো। এই নাটকটি অভিনয় করতে সেদিন হাজার হাজার জনতার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ পেলাম। রাজা ও রানিমা মুগ্ধ হয়ে অনুরোধ করলেন আরও একটি নাটক লিখতে, তখন দুটি নাটকের পর লিখলাম 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটি। যে আশ্রমে বিদ্যাভ্যাস করতাম সেই আশ্রমের বর্ণনাটি তুলে ধরলাম, রূপক নাম দিলাম কণ্বমুনির আশ্রম। এই আশ্রম ও রাজবাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গার একটি শাখানদী কমলা— যা নাটকে রয়েছে মালিনী নদী। এই আশ্রমে বিদ্যাবতী ও তার সহচরীদের সঙ্গে যেমন ভাবে দেখেছি ঠিক তেমনিভাবে এঁকেছি শকুন্তলা নাটকে। এই নাটকটিতে আমার গুরুদেব কণ্বমুনির ভূমিকায় এবং আমি অভিনয় করেছি রাজা দুষ্যন্তের ভূমিকায়— যেমনভাবে আমি আশ্রমে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম বিদ্যাবতীকে। গুরুদেবের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি, নারীদের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত। 'প্রত্যেক নারীর উচিত পিত্রালয় যতই ঐশ্বর্য শালিনী হোক না কেন স্বামীর গৃহে থাকাই শ্রেয়। স্বামী বিরুদ্ধাচরণ করলেও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা কখনো উচিত নয়। এইভাবে নারীরা সুগৃহিণীর মর্যাদালাভ করে। প্রতিকূল আচরণে যারা লিপ্ত হয় তারা বংশের অগৌরবের কারণ হয়ে থাকে। শাঙ্গরবের মুখ দিয়ে বলতে চেয়েছি, যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী এমন কাজে লিপ্ত হতে পারে তাকে কর্তব্য জ্ঞান সম্পর্কে কী জ্ঞান দেওয়া যায়? পতিগৃহে দাসীবৃত্তি করে অবস্থান করা অনেক মর্যাদার। বিদ্যাবতীকে বিবাহের সময় একটি আংটি দিয়েছিলাম। বিবাহের পর বিদ্যাবতী শাঁখা ও সিঁদুর মুছে দিয়ে বিধবা নারীদের মতো জীবনযাপন করতে লাগল কিন্তু আমার দেওয়া আংটি হাতে পরত। আমার প্রকৃত নাম রাজবাড়ির অনেকে জানত। আংটিটিতে আমার নাম লেখা ছিল। কিন্তু আংটিটির সঙ্গে নামটি কখনো মিলিয়ে দেখতো না। আমাকে চিনতেও পারতো না, এ যেন দুর্বাসা মুনির অভিশাপ। তাই এই নাটকটিতে আংটিটির কথা ও অভিশাপের কথা উল্লেখ করেছি। এ বাড়িতে সকলেই আমাকে গভীরভাবে ভালোবাসত, আমিও সকলকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতাম; কিন্তু জামাই বলে কেউ চিনত না। দুর্গাপুজোর পর নাটকটি অনুষ্ঠিত হলো। হাজার হাজার দর্শকের সামনে পেলাম রাজা ও রানিমার আশীর্বাদ। সেদিন এই নাটকটি অর্পণ করেছিলাম বিদ্যাবতীর হাতে। বিদ্যাবতী নাটক দেখতে খুবই ভালোবাসত। বিদ্যাবতীর

নিজের জীবনকাহিনি কিছু কিছু মিলে যাওয়ায় বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নাটকের শেষে আমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করে বলেছিল— হ্যাঁ। সত্যই সুপণ্ডিত জ্ঞানী নাট্যকার। এইভাবে লাথি মারার প্রতিশোধ দিলাম বিদ্যাবতীর কাছে।

তারপর নেমে এল জীবনের উপর কালবৈশাখী ঝড়। সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে ছিল হাজার বছরের পুরানো বটগাছ। পাশে ছিল মহাদেবের মন্দির। সরোবরের পশ্চিম পাশে ছিল শান বাঁধানো ঘাট। এই ঘাটের তলদেশ দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে যেতে হতো রাজপ্রাসাদে। রাজা, রানিমা ও রাজকন্যারা প্রতিদিন স্নান করতে, কোনো সময়ে প্রাতর্ভ্রমণে আসতেন পালকিতে করে। মাঝে মাঝে সরোবরের মুকলিত পদ্মের সৌন্দর্য উপভোগ করতে, কোনো কোনো সময় মহাদেবের মন্দিরে পুজো দিতে প্রণাম করতে। প্রতিদিন সকালে, নতুবা সন্ধ্যার সময় বেদপাঠ করতাম সরোবরের তীরে মহাদেবের মন্দিরে বসে। একদিন উদ্ভিন্ন-যৌবনা বিদ্যাবতী প্রকাশ করল সখীদের কাছে ঠাকুরমশাইকে বিয়ে করতে চাই। কারণ রাজা ও রানিমা রাজকন্যাকে বহুবার বুঝিয়েছেন— যে ঘটনা ঘটে গেছে বিদ্যাবতী ভুলে যাও, আবার নতুন করে বিয়ে কর। বিদ্যাবতীর গোপন প্রেমালাপ গেল রাজা ও রানিমার কাছে। কিন্তু সন্দেহের দানা বাঁধল সহচরীদের মধ্যে--- এই ঠাকুরমশাই তো মনে হচ্ছে এই বাড়ির জামাই। কথাটা কানে গেল রানিমাদের। পরদিন প্রভাতে পালকিতে করে রাজা ও রানিমা চলে গেলেন মহাদেবের মন্দিরে। গ্রামের বহু কুলবধূ জল আনতে গিয়ে শুনছে বেদমন্ত্র। আমাকে দেখে রাজা ও রানিমার শরীরে বয়ে গেল বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো শিহরণ। হ্যাঁ! এই ঠাকুরমশাইতো আমাদের বাড়ির জামাই। নীরবে রাজদরবারে ফিরে গেলেন রাজা ও রানিমা। পরদিন ডাকা হলো রাজসভা। সকলেই একমত হলেন পণ্ডিতমশায়কে ফিরিয়ে আনা হোক রাজপুরীতে।

রাজা ও রানিমা বিদ্যাবতীকে ডেকে নির্দেশ দিলেন— মা, নারীর জীবনে বিবাহ একবারই হয়। স্বামী যতই খারাপ হোক না কেন, যখন অগ্নিসাক্ষী করে বেদমন্ত্র শ্রবণ করে শপথ করেছ, আহারে-বিহারে, শয়নে-স্বপনে, সকল সময়ই থাকবে স্বামীর কাছে। তুমি কি সীতার জীবন ইতিহাস পড়নি? তাই মা, তোমার উচিত ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য। বিদ্যাবতীর মুখখানা শুকিয়ে গেল গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রদহনে বৃন্তচ্যুত প্রস্ফুটিত গোলাপের মতো। পরদিন ঊষালগ্নে সহচরীদের সাহচর্যে শুভলগ্নের সময় যেই রূপ সজ্জায় সজ্জিতা হয়েছিলেন, সেইরূপ স্বর্ণ মণিমুক্তায় বিভূষিতা, অগুরু চন্দন চুয়ায় চর্চিতা, অপূর্ব সুন্দর বস্ত্রাভরণে শাঁখা ও সিন্দুর পরিহিতা অপ্সরী বেশে বিদ্যাবতী বেরিয়ে পড়ল পালকিতে করে মহাদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে। সঙ্গে গেলেন রাজবাড়ির গুরুস্থানীয়া কয়েকজন মহিলা ও সহচরী। প্রতিদিন যেমন ভাবে পুজো করতাম ঠিক সেইভাবে পুজো করেছি মহাদেবের মন্দিরে। সেদিন শিব চতুর্দশী। মন্দিরের বিপুল ভিড়, বিদ্যাবতী মন্দির প্রাঙ্গণে এসে নতজানু হয়ে প্রণাম করল, সঙ্গীসাথীরা মহাদেবকে উদ্দেশ্য করে প্রণাম জানাল নতজানু হয়ে। আমি তখন একমনে পূজা করে চলেছি। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সকলেই শুনছে বেদমন্ত্র। বিদ্যাবতীকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ির গুরুস্থানীয় জনৈকা মহিলা এগিয়ে এলেন আমার কাছে। বৃদ্ধা মহিলা কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন— এই চপলা-চঞ্চলা বালিকা ভুলবশত একদিন পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তুমি একে ক্ষমা কর। যে নারীকে একদিন তুমি অগ্নিসাক্ষী করে বিবাহ করেছিলে, এই সেই নারী তোমার স্ত্রী, তুমি গ্রহণ করো।

হঠাৎ আমি গুরুগম্ভীর স্বরে বলে উঠলাম, থামুন— আমি দিব্যচক্ষুতে দেখতে পাচ্ছি, বহু যুগ ধরে রাজ পরিবার আরাধনা করছে মা সরস্বতীর। স্বর্গের দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে পাঠিয়েছেন বিদ্যাবতীকে। বাল্যকালে আমি ছিলাম মাতৃহারা, মাতৃ-স্বরূপিনী, মায়ের মতো আমাকে আশীর্বাদ করেছ, তাই আমি পেয়েছি অমৃতের সন্ধান। গুরুর দীক্ষান্তে সমস্ত রমণীকে আমি মাতৃতুল্য ভক্তি করে আসছি। তুমি আমার কাছে বিশ্বরূপিনী মা। এই পঙ্কিল সংসার জীবনে আমাকে কারারুদ্ধ করো না। তোমরা আমার সাধনার পথ কলুষিত করো না। তখন পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকল বিদ্যাবতী। আমি তাঁরই চরণযুগলে সরস্বতীর বন্দনা করে এক পা এক পা করে বেরিয়ে পড়লাম গুরুগৃহে। পিছন ফিরে দেখলাম মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসে রয়েছে সবাই। দেখলাম বিদ্যাবতী মহাদেবের প্রস্তর মূর্তিকে ধরে কান্নায় ভেসে যাচ্ছে। পুরনারীগণ সকলেই কান্নায় ভেসে যাচ্ছে। ফিরে এলাম গুরুগৃহে। সেদিন ছিল আশ্রমের উৎসব। বহু দূর দূরান্ত থেকে এসেছে মুনিঋষি, বহু পণ্ডিত, বহু ভক্ত। কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নেমে এল সন্ধ্যা। দেখতে দেখতে নেমে এল গভীর রাত্রি। গুরুদেবের পায়ে প্রণাম জানিয়ে জানালাম সকল বৃত্তান্ত। গুরুদেব হাসিমুখে বললেন--- আমিও গিয়েছিলাম রাজার নির্দেশে রাজপরিবারে। আমি তোমার মনের কথা বলে এসেছি রাজামশাইকে। গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় ছিল রাজা বিক্রমাদিত্যের। তিনি একখানা পরিচয় পত্র লিখে দিলেন আমার হাতে। গভীর রাত্রি। ধ্রুবতারাকে লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়লাম নতুন যাত্রা পথে। এগিয়ে গেলাম প্রণাম করতে মহাদেবের মন্দিরে। দেখলাম অভূতপূর্ব দৃশ্য। তখনও আকুল কান্নায় ভেসে যাচ্ছে বিদ্যাবতী। যে বিদ্যাবতী একদিন ভারতবর্ষের বহু পণ্ডিত ব্যক্তিকে তর্কে হারিয়ে দিয়েছিল আজ সে নিরুত্তর। কয়েকজন সহচরী সান্ত্বনা দিচ্ছে। শেষবারের মতো দেখা করলাম বিদ্যাবতীর সঙ্গে। একই কথা আবার বললাম— বিদ্যাবতী তুমি ভুল করনি, গৃহে ফিরে যাও। ঘিয়ের প্রদীপের আলোয় সরোবরের চতুর্দিকে আলোকিত। মন্দিরের পেছনে পালকিবাহকরা বসে গাঁজা খাচ্ছিল। আকারইঙ্গিতে বললাম গৃহে নিয়ে যাও। সখিরা ধরাধরি করে পালকিতে তুলল। আমিও সঙ্গে গেলাম। একে একে রাজবাড়িতে প্রবেশ করছে সবাই। করুণ কান্নায় বিদ্যাবতী প্রশ্ন করল— আমার কী হবে? আমি তখন আবার বললাম— ঈশ্বরের সাধনাই জীবনের একমাত্র পথ— ভুলে যাও রূপ ঐশ্বর্য। বলার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বিদ্যাবতী। সেই করুণ দৃশ্য এখনও ভুলতে পারিনি। একে একে সকলে প্রবেশ করল রাজবাড়িতে। সামনে ছিল কালীমায়ের মন্দির। প্রণাম জানালাম মাকে, মা! আমি তোমার দাস। আমার চলার পথ দেখাও। কয়েকদিন পর পৌঁছলাম বিক্রমাদিত্যের রাজসভায়। সেদিন থেকে আমার নাম হলো কালীর-দাস 'কালীদাস'। ভারতবাসীর কাছে এই নামেই পরিচিত। হে আমার ভারতবাসী!

বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি বিভাজন : সিঁদুরে মেঘ

ঘটনা এক, এক বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের জনৈক সাংবাদিক রাজ্যের বিধানসভা উপনির্বাচনে ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে প্রশ্ন করেছিল, ভবানীপুরে বিজেপির অবাঙ্গালি ভোটব্যাঙ্ক নিয়ে কী ভাবছেন? জবাবে প্রিয়াঙ্কা সটান বলেন, আমরা ভোটারদের ওভাবে ভাগ করি না। ওটা তৃণমূলের স্বভাব। ওঁরা কে দুধেল গাই, কে নয়— এই ভাবে ভোট ভাগ করতে অভ্যস্ত। ঘটনা দুই, গণেশ চতুর্থীতে রাজ্যের ক্রমবর্ধমান গণেশ পূজা নিয়ে। গণেশ পূজা বাঙ্গালির ঐতিহ্য নয়। গণেশ বাঙ্গালির দেবতা নয়। বাঙ্গালির গণেশ নাদুসনুদুস ভুঁড়িওয়ালা, অবাঙ্গালি গণেশের মাসল থাকে, ইত্যাকার নানা মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দিনভর ওইদিন উড়ে বেরিয়েছে। এই দুই ঘটনার আপাতদৃষ্টিতে কোনো যোগসাজশ না থাকলেও, রাজ্য-রাজনীতির ব্যাপারে যারা ন্যূনতম খোঁজখবর রাখেন, তাদের ধরতে অসুবিধে হবে না যে, তৃণমূল তাদের বাঙ্গালি সেন্টিমেন্ট নিয়ে রাজনীতির খেলা শুরু করে দিয়েছে। মুখে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর কথা বললেও, তা যে নেহাত প্রবোধবাক্য তা এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। বাঙ্গালি ভোটব্যাঙ্কের পাশাপাশি হিন্দিভাষী ভোটব্যাঙ্ক, মাড়ওয়ারি ভোটব্যাঙ্ক ইত্যাদি এমনতর ভোটব্যাঙ্ক ভাগ করে তৃণমূল ভোটের লড়াইয়ে এগিয়েছে, এবং কিছুটা হলেও তাতে সাফল্য লাভ করেছে, এই ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রবণতা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে, আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ক্ষেত্রে যে অতি বিপজ্জনক একটি প্রবণতা তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এটাকে মামুলি কোনও ভোটের কৌশল ভাবলে ভুল হবে। একথা সকলেরই জানা তৃণমূল দলটা পরিচালিত হয় মূলত নকশালপন্থীদের দ্বারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করেন, একথাও সকলের জানা। এই শ্রেণীর বামপন্থীরা আদর্শগতভাবে জাতীয়তা (ন্যাশনালিজম) বিরোধী, কিন্তু সাব-ন্যাশানালিজম নামক কিম্ভূতকিমাকার একটা বিষয়কে সমর্থন করে। মুখে আন্তর্জাতিকতার বুলি আওড়ায়, কিন্তু এই ভারতের বুকে এরা প্রবলভাবে আঞ্চলিক। ভারতে এরা আরও একটি নামে বিশেষভাবে পরিচিত, সেটা হলো টুকরো- গোষ্ঠী। দেশকে টুকরো করাই এদের একমাত্র লক্ষ্য। উত্তর-পূর্ব ভারত ইত্যাদি জায়গায় যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমস্যা প্রবল সেখানেই এরা একদা স্লোগান তুলেছিল, ভারত তেরি টুকরো হোঙ্গে, ইনশাল্লাহ, ইনশাল্লাহ। এই দেশের কমিউনিস্টদেরও সার্বিকভাবে এটাই আদর্শ। সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে যেসব কমিউনিস্ট পার্টি ছিল, তারাও মুখে কিছু না বলতে পারলেও তাদের কর্মপদ্ধতি দেশ-বিভাজনের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়। যেমন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে বঞ্চনার অভিযোগ, রাজ্যে শাসন করবো অথচ কেন্দ্রে সরকারের যোগদান করবো না, তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতাকে রোখার স্বার্থে দরকারে কেন্দ্রের সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন এই নজিরও আমরা দেখেছি।

বাঙ্গালি ঘরপোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ডরায়। আঞ্চলিকতার বিষবাষ্পে নিমেষে যে সাম্প্রদায়িকতায় মোড় ঘুরিয়ে, হিন্দু বাঙ্গালির জীবন-জীবিকা বিপন্ন করতে পারে, এমনকী ভিটেমাটিটুকুও যে কেড়ে নেবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে?

অর্থাৎ সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে থাকা কমিউনিস্টরাও নিজেদের সীমাবদ্ধতা জানতো। ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি প্রয়োগ করে তারা দেশের কিছু রাজ্যে ক্ষমতা কায়েম করতে পেরেছিল এবং দেশভাগের সময় তাদের দ্বিজাতিতত্ত্বের ফলিত প্রয়োগ পাকিস্তান, ১৯৪৭-এর আবার সাবন্যাশানালিজমের নতুন মোড়কে হাজির হয়েছে, বলা বাহুল্য, যার একটাই লক্ষ্য দেশভাগ। দেশভাগের লক্ষ্যে কমিউনিস্টদের এই ছল-চাতুর্যের সঙ্গে অন্তত বাঙ্গালিরা সুপরিচিত।

তৃণমূল আঞ্চলিক দল। একথা অস্বীকারের কোনও উপায় নেই, আঞ্চলিক দলের নিজস্ব কিছু অঞ্চলভিত্তিক অ্যাজেন্ডা থাকে। সেগুলো তারা ভোটের সময় কাজেও লাগায়। যেমন শিবসেনারও এরকম অ্যাজেন্ডা আছে। কিন্তু আঞ্চলিক অস্মিতা শুধু যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ময়দানে সুকৌশলে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই নয়, মূলত রাজ্যের শাসক দলের তাঁবেদার একটি তথাকথিত অরাজনৈতিক গোষ্ঠীর জাতিবিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে লাগছে। সেইসঙ্গে তথাকথিত বাম- ইন্টেলেকচুয়াল -দের সাবন্যাশানালিজম তত্ত্ব একে সমর্থনের কাজে তো লাগছেই, গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে তৃণমূল জেনে কিংবা না জেনে বা ভোটের স্বার্থে একে ব্যবহার করছে। এরা ১৯৪৬- ৪৭-এর পরিস্থিতি আরও একবার তৈরি করে ফেলেছে। বাঙ্গালি ঘরপোড়া গোরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ডরায়। আঞ্চলিকতার বিষবাষ্পে নিমেষে যে সাম্প্রদায়িকতায় মোড় ঘুরিয়ে, হিন্দু বাঙ্গালির জীবন-জীবিকা বিপন্ন করতে পারে, এমনকী ভিটেমাটিটুকুও যে কেড়ে নেবে না, তার গ্যারান্টি কে দেবে? ▯

বিশের অঙ্গীকার, বাংলা ভাষা সংস্কার

স্বর্ণাভ মিত্র

দেশাত্মবোধক গান হিসেবে গোটা ভারতে দুটো গান খুবই জনপ্রিয়। একটা হলো, 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা' আর দ্বিতীয়টা লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া 'এ মেরে ওয়াতন কে লোগো'। এই গান দুটো শুনে অনেকেরই দেখেছি আবেগে চোখ বুজে আসে। অথচ অদ্ভুতভাবে এ দুটোর একটাও শুনে আমার মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয় না। এর কারণটা হলো এই দুটো হিন্দি গানে অজস্র আরবি ফারসি শব্দ রয়েছে। বাংলা দেশাত্মবোধক গানগুলো যেমন, 'মুক্তির মন্দির সোপানতলে'-তে যেভাবে দেশমাতৃকার বন্দনা করা হয়েছে, সেরকম বিশুদ্ধ দেশীয় শব্দের গান হিন্দিতে খুব বেশি নেই। বাংলায় বিশেষত্ব এটাই। এই ভাষায় আরবি ফারসি শব্দগুলো খুব ভালো ভাবে বসার জায়গা পায় না। যেগুলো বসে সেগুলোও প্রচণ্ড বিসদৃশ ঠেকে। তাই খুব সহজেই ধরা পড়ে যায় যে কোন শব্দটা স্বদেশি আর কোনটা বিদেশি। ঠিক এই কারণেই হয়তো রেগেমেগে বাংলা ভাষাকে ধর্মান্ধ জিহাদিরা নাম দিয়েছে 'কুফরী জবান'। কারণ তাদের লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষার মধ্যে গাদা গুচ্ছের আরবি ফারসি ঢুকিয়ে, এ ভাষার খোলনলচে পালটে দেওয়া। কিন্তু বাংলার শেকড় এতই শক্ত যে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে তৈরি ভাষার শব্দগুলো বাংলায় খুব বেশি দাত ফোটাতে পারেনি।

তবে তার মানে এই নয় যে সেই চেষ্টা হয়নি বা হচ্ছে না। বাংলা ভাষার আরবীকরণ ধর্মান্ধ জিহাদিদের হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন। এই উগ্রপন্থী গোড়ামির মাত্রা এতই বেশি ছিল যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। একটি নিবন্ধে তিনি বাংলাভাষী মুসলমানের গোঁড়ামিকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন— 'শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে আরবীআনা পারসীআনা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজি স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে পারসি বা আরবি ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন?' এই আরবীকরণ করার চেষ্টাও আবার দু'ভাবে হয়েছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে। এই দু'রকম পরিবর্তন একটু ভালোভাবে বোঝার দরকার রয়েছে।

(১) প্রত্যক্ষ পরিবর্তন হলো, বাংলা শব্দের বদলে সরাসরি আরবি-ফারসি শব্দের প্রচলন করা। যেমন— 'ভূমি'-র বদলে 'জমি' বা 'জায়গা'। আকাশির বদলে 'আসমানি'।

(৩) পরোক্ষ পরিবর্তনটা একটু সূক্ষ্ম। পরোক্ষ পরিবর্তনে বাংলার বদলে সরাসরি আরবি ফারসি শব্দ আনা হয় না, কিন্তু বাংলা ভাষা থেকে তার স্বাভাবিকত্বটাকে মুছে দেওয়া হয়। যেমন— 'রামধনু' পালটে 'রংধনু'! 'কই মাছের হর-গৌরী' পালটে 'কই মাছের গঙ্গা-যুমনা'। আরও এক ধরনের পরোক্ষ পরিবর্তন হয়, সেটার মূল লক্ষ্য হলো বাংলাভাষী মুসলমানের বাংলার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। যেমন— জলের পরিবর্তে 'পানি' কথাটার ব্যবহার। জল আর পানি দুটোই সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু হিন্দুরা যেহেতু 'জল' ব্যবহার করেন, শুধুমাত্র সেই কারণে মুসলমানরা জল ছেড়ে 'পানি খাওয়া' ধরলেন।

এই পরোক্ষ পরিবর্তন নিয়ে একটা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলেই নয়। গত ১৬ জুন জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আইলো রে নয়া দামান' গানটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রজন্মের দম্পতিদের মধ্যে। অনেক টলিউড তারকাই সেদিন এই গানটি নানাভাবে নিজেদের ভিডিয়োতে ব্যবহার করেছিলেন। তবে যে কোনো জাত্যভিমানী বাঙ্গালির মনে এই গানে 'জামাই'য়ের বদলে 'দামান' শব্দের ব্যবহার একই সঙ্গে বিরক্তি ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। কারণ 'জামাই'য়ের হিন্দি/উর্দু প্রতিশব্দ 'দামাদ' সাধারণত উত্তর ও মধ্য ভারতে বহুল ব্যবহৃত হয়। গানটা সম্পর্কে খোঁজ নিতে গিয়ে বেরিয়ে আসে এক অতি চাঞ্চল্যকর তথ্য। ১৯৭২-৭৩ সালে শ্রীহট্টের (বর্তমান সিলেট) লোকসংগীত শিল্পী দিব্যময়ী দাশ 'আইলো রে নয়া জামাই' গানটি রচনা করেছিলেন। তাঁর পুত্র রামকানাই দাশ গানটি গেয়েছিলেন। বাংলাদেশের জেহাদি শাসনযন্ত্র ও তাদের পোষ্য সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলির সৌজন্যে 'জামাই' বদলে হয়ে গেছে 'দামান'। জামাই হলো সংস্কৃত শব্দ জামাতার চলতি রূপ। দামাদ কথার উৎপত্তিও সংস্কৃত 'জামাতা' শব্দে। কিন্তু ওই যে, আলাদা হবার লোভ। তাই হিন্দুরা যদি জামাই বলে, তাহলে ওঁদের অবশ্যই সেটাকে 'দামান' বলতে হবে। আশ্চর্যের ব্যাপার, হিন্দি 'কিউ কি'র অনুকরণে বাংলায় 'কেন না' বদলে গিয়ে 'কেন কি' হয়ে গেলে চন্দ্রিল ভট্টাচার্যরা মাথা খারাপ করে ফেললেও বাবা-মা, কাকা-কাকি, দাদু/ঠাকুর্দা, দিদা/ঠাকুমা, মাসি, পিসি ইত্যাদি চিরাচরিত বাঙ্গালি সম্পর্কগুলোকে যারা আরবি কায়দায় আব্বু-আম্মি, ফুফ-ফুফী, নানা-নানী, চাচা-চাচী ইত্যাদি শব্দে সম্বোধন করে তাদের বাঙ্গালি প্রমাণ করতে এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টার কোনো খামতি দেখা যায় না।

এই মা-বাবা প্রসঙ্গে একটি প্রচলিত কুতর্কের জবাব দেওয়া যাক। ফেসবুক থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রায়শই বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ দাবি করে থাকেন, বাংলাভাষী মুসলমান গোষ্ঠীর 'আব্বু' বলা নিয়ে কারো অসুবিধা থাকলে তার 'বাবা' সম্বোধন নিয়েও আপত্তি থাকা উচিত কারণ 'বাবা' নাকি একটি তুর্কি শব্দ! এই হাস্যকর যুক্তির প্রত্যুত্তরে দুটি কথা বলা যেতে পারে। এক, 'বাবা' যদি তুর্কি আগ্রাসনের ফলে বাংলা ভাষার আমদানিকৃত হয় তাহলে বাংলাভাষী মুসলমান জনগোষ্ঠী এই তুর্কি শব্দটির বদলে উর্দুভাষীদের অনুকরণে আব্বু শব্দটি ব্যবহার করে কেন? দুই নম্বর এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বাংলা ছাড়াও একাধিক ভাষায় কোনো শব্দ আছে মানেই এই নয় যে সেই শব্দটা বাঙ্গালিরা অন্যদের থেকে টুকেছে। বাংলা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ভাষা। ফলে ওই শব্দটা বাঙ্গালিদের দেখাদেখি অন্যরা নিয়েছে, এরকমটা হবারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ভেবে দেখুন, সংস্কৃত 'মাতৃ'

থেকে ইংরেজি 'মাদার' কথাটা এসেছে, পিতৃ থেকে ফাদার, ভ্রাতৃ থেকে ব্রাদার। ভেবে দেখুন তো ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের দেশের দূরত্ব কতখানি। তাহলে এত দূরের ভারতবর্ষ থেকে শব্দ নিয়ে যদি ইংরেজরা মাদার, ফাদার, ব্রাদার বানাতে পারে; তাহলে বাংলা থেকে 'বাবা' শব্দটা কেন তুর্কি অবধি যেতে পারে না? এই যে আমরা এটা ভাবতেই পারি না যে তুর্কিরাও বাঙ্গালির বানানো শব্দ নিতে পারে, এটা আপনাদের দাস মনোবৃত্তির পরিচয়।

দুর্ভাগ্যবশত এই দাস মনোবৃত্তি বাঙ্গালির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকিয়ে দেওয়ার নোংরা চক্রান্ত সীমাহীন ইতিহাস বিকৃতির হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। যে বিকৃত ইতিহাস শেখায় বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব নাকি হয়েছিল বখতিয়ার খিলজি নামক এক তুর্কি দস্যুর বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে! বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেতে পারে না কারণ এই ভাষার বয়স নাকি হাজার বছরের বেশি নয়! বিজয় সিংহের লঙ্কাবিজয় বা গঙ্গারিডি সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকাকে মাটিচাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়। তথাকথিত 'বাঙ্গালির দেশ' বাংলাদেশে রাজা গৌর গোবিন্দের হত্যাকারী ইয়েমেনি দস্যু শাহজালালের নামে তৈরি হয় মাজার থেকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। তাই বাঙ্গালিও ধীরে ধীরে বিশ্বাস করতে শুরু করে, 'বাবা' শব্দটি তুর্কি থেকেই বাংলায় এসেছে। উলটোটাও যে সম্ভব হতে পারে, এই চিন্তা তার মাথাতেই আসে না।

বাংলা ভাষা সংস্কারের পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হলো বাঙ্গালির মধ্যে ঢুকে থাকা এই দাস মানসিকতা। বাঙ্গালিকে গেলানো হয়েছে যে বাঙ্গলাতে উড়ে এসে জুড়ে বসা এসব আরবি ফারসি শব্দ, এগুলো নাকি বাংলা ভাষাকে দারুণ সমৃদ্ধ করেছে। এগুলো ছাড়া নাকি বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, গান কিছুই ভাবা যায় না। কিন্তু কোনো কাজের শুরু তো হয় সেই কাজ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার মাধ্যমে। এখন বাঙ্গালি যদি ভাবতেই না পারে ভাষা সংস্কারের কথা, তাহলে ভাষার সংস্কারটা হবে কী করে? আর সংস্কার মানে হলো, ভাষাকে তার মূল অবিকৃত অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেটার প্রথম ধাপ হলো বাঙ্গালির মধ্যেকার এই মানসিক বাধা সমূলে উপড়ে ফেলা।

বাঙ্গালিকে বিশ্বাস করতে হবে যে বাংলা ভাষার জন্য বাংলা শব্দই যথেষ্ট। কোনো আরবি ফারসি, ইংরেজি, উর্দু শব্দের দরকার নেই। একটা সময় ছিল যখন বাঙ্গালি খুব সফলভাবে বাংলার আরবীকরণ রোধ করেছে। অদ্ভুত কায়দায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। বিভিন্ন আরবি ফার্সি শব্দকে তাচ্ছিল্য, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিমায় ব্যবহার করার চল জনপ্রিয় হয়েছিল, কারণ সেদিন বাঙ্গালির মধ্যে স্বজাত বিরোধী বুদ্ধিজীবী নামক দালালের দল অনুপস্থিত ছিল। যেমন, ইসলামিক জ্ঞানের উপাধি 'ফাজিল'কে বাঙ্গালিরা সম্পূর্ণ ঠাট্টাচ্ছলে ব্যবহার করতে শুরু করে। জ্ঞানী অভিজ্ঞ মুসলমানদের 'বুজুর্গ' বলা হতো। বাঙ্গালিরা সেটাকে বানিয়েছিল বুজরুক যা আজও ভণ্ড অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার তুর্কি ভাষায় 'উলুঘ' মানে হলো 'মহান'। বাঙ্গালিদের হাতে পড়ে ওই শব্দ বদলে যায় উল্লুকে! উল্লুক মানে বোকার হদ্দ। এভাবে ভাষা দিয়েই ভাষাকে দমন করার অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করেছিল প্রাচীন বাঙ্গালি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গায়ের জোরে যেসব বহিরাগত শব্দকে বাংলায় ঢোকানো হয়েছে, সেগুলোকে চেনার খুব সহজ কিছু উপায় আছে। কোনো শব্দ যখন জাতির ভিতর থেকে সৃষ্টি হয়, সেই শব্দের অনেক শাখা-প্রশাখা তৈরি হয়। যেমন— জল থেকে জলাশয়, জলীয়, জলজ, জলা ইত্যাদি। জল যদি মূল শব্দ হয়, তাহলে জলজ, জলাশয় ইত্যাদি শব্দগুলোকে মূল শব্দের 'শাখা শব্দ' বলা যায়। লক্ষ্য করলে দেখবেন, যে সব শব্দ আরবি ফারসি থেকে এসেছে তাদের শাখা শব্দ প্রায় নেই বা থাকলেও খুবই কম। যেসব আরবি শব্দগুলো অনেক কাল আগে বাংলা ভাষায় এসেছে তাদের একটা দুটো শাখা শব্দ তৈরি হয়েছে। তবে যেগুলো নতুন এসেছে, তাদের একেবারেই হয়নি। যেমন, খুন শব্দটা আগে এসেছে, তাই এর থেকে 'খুনি' শব্দটা তৈরি হয়েছে। কিন্তু 'নিয়ামত', 'মেজবান' এগুলো নতুন আসা শব্দ। তাই এগুলোর কোনো বাংলা শাখা শব্দ তৈরি হয়নি।

এমনকী বহু প্রচলিত শব্দ রয়েছে যেগুলো আরব থেকে অনেকদিন আগে এলেও আজও যেন ঠিক বাংলার আপন হয়ে উঠতে পারেনি। তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো যে তাদের থেকে প্রায় কোনো নতুন শব্দ জন্ম নেয়নি।

যেমন ধরা যাক 'জমি' শব্দটি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালির ইতিহাস আদিপর্ব' বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় 'ভূমি বিন্যাস'-এ প্রাক ইসলামিক বঙ্গের বিবরণ দিতে গিয়ে ছত্রে ছত্রে 'ভূমি' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাঙ্গলায় ইসলামিক অনুপ্রবেশের পরে যখন তৎকালীন প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে ও সুলতানি শাসকদের কুক্ষিগত হয় তখন রাজস্বযন্ত্রের ইসলমিকরণের হাত ধরে পাট্টা, মৌজার মতো অজস্র ফার্সি, আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ বাংলা ভাষায় ঘটে। তেমনি 'ভূমি' হয়ে যায় জমি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গত কয়েকশো বছর ধরে জমি শব্দটির ব্যবহার অতি সীমিত অর্থেই হয়ে থাকে। জমি মানে শুধু সম্পত্তির হিসেবে মাটি। অন্যদিকে ভূমি শব্দটি থেকে ভূমিহীন, ভূমিজ, ভূমিপুত্র, ভূমিসংস্কার, জন্মভূমি, ভৌম, ভৌমজল ইত্যাদি বহু শব্দ তৈরি হয়েছে এবং তা দৈনন্দিন জীবনে যথেষ্ট ব্যবহারও হচ্ছে, কারণ বাংলা ভাষার শিকড়ে সংস্কৃত। অথচ আমরা কখনও অনুরূপভাবে জমি থেকে জমিপুত্র, জমিজ, জৌম, জন্মজমি ইত্যাদি শব্দ বানিয়ে নিতে পারিনি। অর্থাৎ 'জমি'র মতো বাংলা শব্দকোষে বলপূর্বক জায়গা করে নেওয়া আরবি ফার্সি শব্দগুলির সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আজও তৈরি হয়নি। আবার ফাজিল, বুজরুকের মতো শব্দগুলোকে বাঙ্গালিরা নিজেদের মতো করে গ্রহণ করেছিল বলে তা থেকে ফাজলামি, বুজরুকি ইত্যাদি শব্দান্তর সম্ভব হয়েছিল।

অতএব ভাষা সংস্কার করতে গেলে প্রথমেই এইভাবে খুঁজে খুঁজে বিদেশি শব্দগুলোকে আলাদা করতে হবে। বিদেশি শব্দগুলোকে বিদেশি বলে চিনতে শেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ধাপ। গ্রিকরা যখন নিজেদের ভাষা সংস্কার করেছিল, এই কাজটা করে উঠতেই তাদের সবচেয়ে বেশি সময় লেগেছিল। কারণ কোনো ভাষার মধ্যে বহু ভাবে বিদেশি শব্দ লুকিয়ে থাকে। বিদেশি শব্দগুলো চিহ্নিত করা গেলেই তার পরের ধাপে পৌঁছানো সম্ভব। অর্থাৎ বহিষ্কার। এই তিন ধাপ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালির করা প্রতিটি ভাষা আন্দোলন, মানভূম, শিলচর বা দাড়িভিট, প্রত্যেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ভাষার লড়াই ভাষা দিয়েই হোক। বিশে সেপ্টেম্বর আমাদের অঙ্গীকার, বাংলা ভাষার আমূল সংস্কার। ◻

।। চিত্রকথা।। শ্রীগুরুজী।। ৯।।

মাধবরাওয়ের কাছে এই সময়টা ছিল নানা বিষয়ে গভীর ভাবনার। তাঁর কিছু ভাবনা তিনি বন্ধুবান্ধবকে লেখা চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন।

২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন— 'যদিও আমি ত্যাগীর জীবন বেছে নিয়েছি কিন্তু এখনও পার্থিব জীবনকে অস্বীকার করিনি। আমার হিমালয়ে যাবার ইচ্ছেটি সঠিক ছিল না। জীবনের সব দায়িত্ব পালন করে এবং জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, আমি এক সর্বত্যাগীর জীবন যাপন করতে চাই। আমি আর হিমালয়ে যাব না। এবার বরং হিমালয় আমার কাছে আসবে।'

সেই সময় মাধবরাওয়ের চিঠি প্রায় দশ-পনেরো পাতার হতো। প্রতিটি চিঠিতেই থাকত বেদান্ত, দর্শন ও আধ্যাত্মিক নানা বিষয়ের আলোচনা। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

'তোমাকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক দেখতে চাই। আমি খুব খুশি হবো যদি তুমি সব দুঃখ আমার সঙ্গে ভাগ করে নাও। তোমার দুঃখ আমার হোক, ঈশ্বরের কাছে আমার এটুকুই প্রার্থনা।'

বাবার অবসরপ্রাপ্তির খবর পেয়ে মাধবরাওয়ের মনে হলো।—

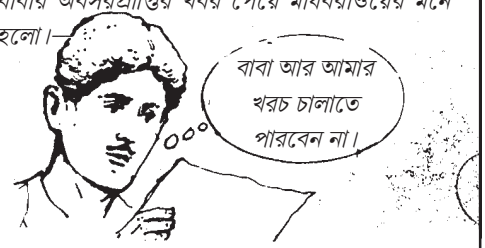

গবেষণা মাঝপথে ছেড়ে তিনি নাগপুর ফিরে গেলেন।

মাদ্রাজ থেকে ফিরে আসার পর তিনি হিসলপ কলেজে লেকচারারের চাকরি পেলেন। নিয়মিত রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়া শুরু করলেন। বেদান্ত দর্শনের ওপর তাঁর আস্থা আরও বেড়ে গেল।

১৯৩০ সালে মাধবরাও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিদ্যার লেকচারার হিসাবে যোগ দিলেন।

মাধবরাও অনেক বিষয় পড়াতে পারতেন। তার জন্য ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নিতেন না।

চলবে